বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বসুন্ধরা বৈঠকের দলিল • বায়োডাইভারসিটি

• ফরেস্ট প্রিন্সিপল

• ক্লাইমেট চেঞ্জ

• এজেন্ডা এ্যকুশ

গ্লোবাল ফোরামে কি হল

নানান মতের পরিবেশ বক্তৃতার নমুনা

বন সংরক্ষণ না মানুষ উৎপাটন

সর্দার সরোবর বাঁধ—মোর্স রিপোর্ট

পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত □ পঞ্চদশ বর্ষ □ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা □ মার্চ-জুন '92 □ দাম দু' টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মার্চ-জুন 1992 ❋ পঞ্চদশ বর্ষ ❋ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা

এই সংখ্যার বিষয়

- বিজ্ঞাপনে পরিবেশ 1
- অযোধ্যাকাণ্ড ও আমরা 2
- বসুন্ধরা বৈঠকের দলিল 3
- গ্লোবাল ফোরাম রিপোর্ট 7
- নাটকীয় পরিবেশ 10
- বন সংরক্ষণ নীতি ও ছিন্নমূল মানুষ 17
- সর্দার সরোবর বাঁধ—মোর্স রিপোর্ট 20

এই সংখ্যায় যারা সাহায্য করেছেন

বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, সুভাষ গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, স্বাতী, স্বপন, মিতা, অসীম, তপন, রবীন চক্রবর্তী।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনের টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট বা মানি-ওর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে নাম-ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রযত্নে: অভিজিৎ লাহিড়ী ☐ পি 252 লেকটাউন ☐ ব্লক-এ, কলিকাতা, পিন 700089

পড়ুন ও পড়ান

- বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাথমিক হালচাল
- বিজ্ঞানশিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল
- না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না

প্রকাশক: **পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা**

আরো কয়েকটা পড়বার মত পত্রিকা

উৎসমানুষ / বিশ্লেষণ / গণ দর্পন / Safe Energy and Envionment / অহল্যা / মানব পরিবেশ / দ্বান্দিক (দুর্গাপুর) গণবিজ্ঞান সমন্বয় বুলেটিন / নাগরিক মঞ্চ বুলেটিন / প্রগতিবার্তা / বিজ্ঞান মঞ্চ বুলেটিন / বিজ্ঞান দিশারী

পড়ুন

পাবলিক সেক্টর, আক্রান্ত জলাভূমি, আক্রান্ত শ্রমিক

নাগরিক মঞ্চ

134 রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড

রুম নং—7 ☐ কলিকাতা-85

বিজ্ঞাপনে পরিবেশ

অনেক দরিদ্র, সরল, বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ প্রতারিত হয়ে থাকেন পঞ্জিকাতে প্রকাশিত কিছু বিজ্ঞাপন থেকে। লুধিয়ানা জলন্ধর দিল্লী কোলকাতা কোথায় নেই এই সব বিজ্ঞাপনদাতারা। এঁদের সওদা হচ্ছে মন্ত্রপূত আংটি, সম্মোহনী রুমাল, আজব আয়না, স্বপ্নলব্ধ ঔষধপূর্ণ কবচ, সব তরংগের বেতার গ্রাহক যন্ত্র, এমন কি টেলিভিশন। এই সব জিনিষগুলি অমিত শক্তিধর এবং কার্যকরী বলে দাবি করা হয় বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষ থেকে। পঞ্জিকার খসখসে পাতা থেকে গ্রহ নক্ষত্র তিথি-লগ্নের সান্নিধ্য এড়িয়ে এ জাতীয় বিজ্ঞাপনগুলি চলে আসছে নামি দামি পত্র-পত্রিকার ঝকমকে অংগের ভূষণ হয়ে। অবশ্য বহিরঙ্গে বিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চরিত্রে নয়। বিজ্ঞাপন দাতার নাম ও পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তন হয়েছে। স্বভাবে নয়। পরিবেশ সচেতনতা যতই বাড়ছে ততই গলাবাজি বাড়ছে এঁদের। অশ্লীল সাহিত্যকে আমরা আখ্যা দিয়ে থাকি পর্ণো-সাহিত্য। এঁদের এই সব বিজ্ঞাপনগুলিকে পর্ণো-পরিবেশচিন্তার উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ভূমিকা আর নয়। কিছু নজির দেখা যাক।

কিছু পরিবেশ প্রেমী মানুষ প্রতিবাদে সরব হয় উঠলেন আমেরিকাতে। সানফ্রান্সিকোর প্যাসিফিক গ্যাস এ্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানী কালিফোর্নিয়ার উপকূলে একটি প্রকল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন বলে। প্রতিবাদের পাল্টা জবাব দিলেন কোম্পানী। চারটি রঙে রঞ্জিত বিশাল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো কোম্পানীর তরফে। বড় বড় হরফে সেই বিজ্ঞাপনে লেখা—"মা প্রকৃতির মুখে হাসি ফোটাই আমরা"। অথচ ঐ কোম্পানী বসাতে এসেছেন একটি পরমাণু চুল্লী!

মার্কিন মুল্লুক কেন? আমাদের এখানকার নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন প্রচারিত বিজ্ঞাপনের শিরোনামা এই রকম—"পরিবেশ সচেতন দেশগুলি কেন পরমাণু শক্তির দিকে ঝুঁকছে?" এর উত্তরে বলা হচ্ছে অনেক কথা। দাবী করা হচ্ছে—"পরমাণু শক্তি পরিবেশ প্রশ্নে পরিচ্ছন্ন।" বলা হচ্ছে—"অন্যান্য বাণিজ্যিক শক্তি উৎপাদনের উৎসের তুলনায় এটির পরিবেশের উপর প্রভাব সামান্যতম। এতে এ্যাসিড বৃষ্টি হয় না। সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত হয় না। চুল্লী বসাতে লাগে সামান্য জায়গা। স্থানীয় মানুষদের পুনর্বাসন করতে হয় কমই।"

ছেড়েই দিচ্ছি আমেরিকার থ্রী-মাইলস্ আইল্যান্ড বা সাবেক সোভিয়েত রুশিয়ার চেরনোবিলের কথা। আমাদের ঘরের রাজস্থান এ্যাটমিক পাওয়ার প্লান্ট কি বলছে? বিগত কয়েক বৎসরে সেখানে সংলগ্ন জনপদগুলিতে চর্মরোগ ক্যানসার আর লিউকিমিয়াতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে কেন?

ষ্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একটি দ্বিখণ্ডিত ফল, বহিরঙ্গে আপেল। বোঁটা আছে তার। আর অভ্যন্তরে দেখা যাচ্ছে কমলা লেবুর কোয়া। লেখা রয়েছে "আপেলও নয় লেবুও নয়।" তারই নীচে লেখা—"অন্যের মাপকাঠিতে ষ্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়াকে আপনি বিচার করতে পারেন না।" এত বাক্যবিন্যাস! অথচ এঁদের দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা থেকে প্রতিদিন কয়েক শো টন লাল কালো সাদা ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। লাল নাইট্রোজেন অক্সাইড আর কালো কার্বন ধোঁয়ায় চারিদিক সর্বদা ভরে আছে।

একটা বিজ্ঞাপনে দেখছি ছোট্ট এক বালিকা দুটি কানে হাত চাপা দিয়েছে। ছবিতে শিশুর আঁকা বাঁকা হাতে লেখা—"শব্দ-দূষণ বন্ধ করুন।" ভাল কথা। পটভূমিকাতে দেখছি একটি চলন্ত বাস। বেসরকারী বাস। বাঘের মুণ্ডু মার্কা নয় সেটি। পরোক্ষে নিচু গলায় বলা হচ্ছে না কি যে সরকারী বাসগুলি শব্দ-দূষণের কারণ নয়? এ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কর্নাটকে কাইগাতে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও বসছে পরমাণু চুল্লী। পেট্রো-কেমিক্যাল ও সার কারখানার বিষে জর্জরিত বোম্বাই শহরের চেম্বুর নতুন খেতাব পেয়েছে গ্যাস চেম্বুর। মূল শহর থেকে কিছু সরে গিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে নিউ বম্বে। সিটি এ্যান্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন অফ মহারাষ্ট্র বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এই নিউ বম্বের। বিজ্ঞাপন ভেসে যাচ্ছে বৃক্ষ প্রেম তথা পরিবেশ প্রেমে। বৃক্ষের নামে হচ্ছে রাস্তাগুলির নাম। নিম, তাল, পিপুল গুলমোহর। হ্যাঁ, জামরুল আর আমড়াও আছে।

"পরিবেশ আমাদের অমূল্য উত্তরাধিকার। আসুন সবাই মিলে পরিবেশ সংরক্ষণ করি। শুধু আজকের নয় অনাগত ভবিষ্যতকেও সুন্দর করে তুলতে।" বিজ্ঞাপনে দিয়েছেন এসব কথা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। বেসরকারী মুনাফালোভী এই প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিককালের কাণ্ডকারখানা তো সবাই জানেন। বজবজের পুজালি গ্রামের কথা বলছি।

রাসায়নিক আর উচ্চফলনশীল বীজ, সেচের জল আর কীটনাশক নিয়ে 'সবুজ বিপ্লব।' অভিজ্ঞতা বলছে ধূসর বিপ্লব। যাই হোক

কীটনাশক প্রস্তুত করার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বেয়ার। এই বিদেশী প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপনে বলছেন—"বেয়ার ইণ্ডিয়া আরো ভাল পরিবেশের জন্য দায়বদ্ধ।"

পরিবেশ-দূষণ নিয়ন্ত্রনের যন্ত্রপাতি ছাড়লেন স্বদেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা। দূষণ না থাকলে এঁদের যন্ত্রপাতির বাজার যাবে হারিয়ে। তাই দূষণের প্রতি এঁদের গোপন প্রেম। সেটা প্রকাশ করা চলে না। তাই "ফ্লাক্ট" বলেন—"শিশুদের জন্য কিছু করুন"। এই ব্যাকুল আবেদন জানাবার আগে দোহাই দেন এ্যারিষ্টটল ডারউইন আর ডেভিড এ্যাটেনবরোর। বিজ্ঞাপনে একটি মুখ—নিষ্পাপ শিশুর।

মাদ্রাজের লক-এয়ার এ. জি ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এক অশ্রুত পূর্ব যন্ত্রের। দরজা খোলা, তবুও—"ধুলো ঢুকবে না, তাপ ঢুকবে না, পোকামাকড় ঢুকবে না—ঢুকবে না কোনো দূষক পদার্থ।" "বাতাসের পর্দা" সব আটকে দেবে। আর ঘরে "সজীবতাকে রাখবে তালাবন্ধ করে।" মূল্য মাত্র 5500 টাকা। আর লেখা আছে "নকল হইতে সাবধান।"

সামাজিক বনসৃজনের হাঁকডাক কমছে। বাজারে এসেছে বাণিজ্যিক বনসৃজন। লোভনীয় বিজ্ঞাপন আসছে। ষ্টার্লিং ট্রী ম্যাগনাম (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের প্রতীক চিহ্নে লেখা রয়েছে—"সামান্য বিনিয়োগ বিশাল লাভ"। মাদ্রাজের এই প্রতিষ্ঠানের কাজ সেগুন গাছের চাষ। এদের প্রতিশ্রুতি 20 বছরের জন্য 975 টাকা বিনিয়োগ করলে পাওয়া যাবে 62,000 টাকা।

এদের গোত্রের কোম্পানী ওকায়া প্লানটেশান। তাদের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে—"আমাদের অসাধারণ সেগুন গাছে আপনার টাকা 150 গুণ বাড়িয়ে তুলুন। (আর আপনার বিনিয়োগ 5 বছর পর ফেরৎ যোগ্য।) তাঁদের দাবী—"এ যাবৎ কাল মানুষের উদ্ভাবিত সবচেয়ে চমকপ্রদ বিনিয়োগ পরিকল্পনা।"

আমাদের সরকারী সপ্তম প্রকল্পগুলি এই সবুজ পুঁজিবাদির ধাক্কা সামলাতে পারবে কি? নমুনাগুলি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে সরকারী আধা-সরকারী বেসরকারী বিদেশী সব প্রতিষ্ঠান পরিবেশ নিয়ে খুব চিন্তিত। সেই চিন্তার প্রতিফলনে বিজ্ঞাপনের এত বহর। যেন মুনাফা নয় পরিবেশ রক্ষা তাঁদের প্রথম কথা। উত্তম কথা। কিন্তু আঁশের গন্ধে ধ্যান ভেঙে যায় যে অনেক গৃহপালিত তপস্বীর। তাই গৃহস্থকে সাবধান হতেই হয়! —বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত

অযোধ্যাকাণ্ড এবং আমরা

6ই ডিসেম্বর 1992 বাবরি মসজিদ—462 বৎসরের সাক্ষী প্রত্নসম্পদ ধূলিসাৎ! পৃথিবীর দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষ টি ভির দৌলতে দেখলো একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে এসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তুর' প্রভাব।

অভূতপূর্বভাবে আক্রান্ত হলো দেশী-বিদেশী আলোকচিত্রী ও সাংবাদিকরা। এসব দেখেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' প্রশাসন নিরাপদ দূরত্বে রাখলো আইনের প্রহরীদের, সুপ্রীম কোর্ট তথা বিচার ব্যবস্থার নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই। ধ্বংসের পর ফিরে যাওয়ার পথে সেবকরা উত্তেজনায় আগুন লাগালো পথের পাশের বসতিগুলিতে। সাতদিন ধরে দাঙ্গায় প্রাণ দিলেন হাজারের অধিক মানুষ। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়িয়ে এ আগুন ছড়িয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্য এবং সুদূর ইংল্যাণ্ডে। এখন চলছে রাষ্ট্রসংঘে চাপান উতোর।

একদল সদম্ভে ইতিহাস, প্রত্নসম্পদ, শান্তিতে বাঁচার অধিকার বলপ্রয়োগে ধূলিসাৎ করে দেখালো তারা ধর্মের ধ্বজাধারী। অন্যদল ধর্মেও আছি ধর্মনিরপেক্ষতাতেও আছি বোঝাতে 'মন্দির মসজিদ ওহি বনেগা'র প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তথা ঐক্যের মহড়ায় আর ক্ষমতার এই লড়াইয়ে জাতি বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় চিহ্নিত হোমো স্যাপিয়েনরা রিলিফ ক্যাম্পবন্দী হয়ে থাকলো বিভ্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষতার অক্ষমতায়। এরই এককোণে পড়ে আছি উৎকণ্ঠিত আমরা। যারা যুক্ত আছি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কর্মযজ্ঞে অথচ পড়ে আছি 'সামাজিক যুথবদ্ধ স্থবিরতার চড়ায়'। দেখছি একদিকে কাঠামোগত সংস্কার, মুক্ত বাজারের প্রবর্তন, মুদ্রাস্ফীতি, বন্ধ নতুন চাকরী, সঙ্কুচিত উন্নয়ন ও সেবামূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ···অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নেতাদের সকল ধর্মগুরুদের আশীর্বাদ ভিক্ষা, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন, ধর্মীয় উন্মাদনা প্রচারের সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা···। অর্থসামাজিক অসামঞ্জস্য ও অজ্ঞতার উর্বর জমিতে সযত্নে প্রোথিত হচ্ছে ধর্মান্ধতার বীজ, যাতে বারে বারে ফলাও করে চালানো যায় দাঙ্গা নামক সেই কুৎসিৎ ব্যাবসাটি।

যুগে যুগে প্রফেটগণ প্রার্থনা করেছেন ইহলৌকিক জীবনে নেমে আসুক শান্তি অহিংসা প্রেমের জোয়ার। অনুপ্রাণিত হয়েছেন নিপীড়িত মানুষেরা। কিন্তু তাদের অনুগামীদের কার্যকলাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানান সম্প্রদায়। হারিয়ে গিয়েছে মানুষের পরিচয়। এবং এভাবেই সভ্যতার এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও সমাজজীবনে শান্তি নিরাপত্তা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। ফলতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হওয়ার অবকাশ থাকলেও শয়তানের অস্তিত্ব নিয়ে মতবিরোধ থাকছে না। একদিকে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি অন্যদিকে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার সন্ধিক্ষণে আমারে দেশে প্রত্ন সম্পদকে ধ্বংস করার মাধ্যমে আক্রমণ করা হলো আমাদের মানুষী অস্তিত্বকে।

'ইয়ে তো সিফ ঝাঁকি হ্যায়'তেই বোঝা যাচ্ছে আমরা কোথায় আছি। তাই এখন আর দেরী নয়। মানুষকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে আমদের দৃষ্টিভঙ্গী হতে হবে একমুখী মানবিক। তবেই আমরা জীবন ও পরিবেশের সপক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম হবো। আর সেইজন্যই আর কোনও 'ঝাঁকি' সৃষ্টির আগেই আমরা দাবী করছি সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ মানুষের ইতিহাস গবেষণার জন্য সংরক্ষিত করা হোক। সত্যের আলোকে পড়া হোক ভারতীয় উপমহাদেশে মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা, যার আলোকে আমরা এগিয়ে চলবো আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের পথে। —প্রদীপ দত্ত

বসুন্ধরা বৈঠকে আলোচিত বিষয়

দুনিয়া জোড়া পরিবেশ সমস্যা সমাধানের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি ব্রাজিলের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল বসুন্ধরা বৈঠক। বিষয়বস্তু চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা হয়। চারটি খসড়া দলিল আগেই তৈরী করা হয়েছিল দীর্ঘ কয়েক বছরের চেষ্টায়। দলিল পাকাপাকি করতে এই মহাসম্মেলন। মূল দলিলের আয়তন বেশ বড়। খুব ছোট্ট করে এর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল।—কোনরকম মন্তব্য ছাড়াই। মন্তব্য বা মতামত পাঠকের কাছ থেকে আসুক চাইছি।

—সঃ মঃ, বি ও বি

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATIC CHANGE

আবহাওয়ার পরিবর্তন-এর ওপর জাতিসংঘের ডাকা এক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন-এর প্রস্তাব গৃহীত হয় গত মে' 92। জাতিসংঘের (UN) সাধারণ সভা (General Assembly) নানা দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী একটা কমিটির হাতে এর-দায়িত্ব দিয়েছিলো। রিওতে এই কনভেনশনের প্রস্তাব গুলো পেশ করা হয় অনুমোদনের জন্যে। ঠিক হয়েছিলো যে রিও মহাসম্মেলনের পরেও 19 জুন '93 পর্যন্ত এই প্রস্তাবে সই করার সুযোগ থাকবে। আরো ঠিক হয় যে এই প্রস্তাব ওই নির্ধারিত দিনের পরে কার্যকরী হবে যদি তাতে অন্ততঃ 50টা দেশ সম্মতি জানায়। 14 জুন, '92 পর্যন্ত 153 টা দেশ ওই প্রস্তাবে সই করেছে।

এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য হল, শিল্প কারখানা নির্গত গ্যাসের কারণে সৃষ্ট গ্রীন হাউস এফেক্ট রোধ করা। শিল্প কারখানা নির্গত বিভিন্ন গ্যাসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটা আস্তরণ তৈরী হয়েছে। সূর্যের আলো সেই আস্তরণ ভেদ করে মাটিতে এসে পড়লেও পৃথিবীর তাপ সেই আস্তরণ ভেদ করে মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারে না। ফলে বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এইসব ক্ষতিকারক গ্যাসকে সাধারণভাবে বলা হয় গ্রীন হাউস গ্যাস। এগুলি মনুষ্যসৃষ্ট গ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে এইসব ক্ষতিকারক গ্যাস বেড়ে চলার হার কমিয়ে আনতে হবে। দেখা গেছে শিল্পোন্নত দেশগুলোই বেশীর ভাগ গ্রীন হাউস গ্যাস উৎপন্ন করে। চূড়ান্ত প্রস্তাবে অবশ্য এটা বলা নেই যে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কতদিনের মধ্যে কটা গ্রীন হাউস গ্যাস উৎপাদন কমাতে হবে। বলা হয়েছে যে মুখ্য উদ্দেশ্য এটাই হবে যে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলতে হবে। এবং তা নামিয়ে আনতে হবে ধীরে ধীরে, যাতে সমগ্র প্রাণীজগত ও পরিবেশ (ecosystem) সেই পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।

সেই লক্ষ্যে পৌছোনোর প্রথম ধাপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে 2000 সালকে। প্রথম বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। সেই অনুযায়ী তারা মেনে নিয়েছে 2000 সালের মধ্যে তাদের ফিরে যেতে হবে 1990 সালের গ্রীন হাউস গ্যাসের স্তরে। এই প্রস্তাবে 2000 সালের পর কী হবে তা কিছু বলা নেই। অন্যদিকে বলা হয়েছে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো 2000 সালের মধ্যে দুবার আলোচনায় বসবে। সেই সময় গোটা সমস্যাটা খুঁটিয়ে বিচার বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে তারা। এই কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন ব্রেজিলের প্রেসিডেন্ট ফার্ণান্ডো কেলির।

BIOLOGICAL DIVERSITY CONVENTION

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা কমিটি (Inter Governmental Negotiating Committee) গত চার বছর ধরে বিচার বিশ্লেষণ ও মতামত বিনিময় করে গত 22 মে, '92 একটা কনভেনশান'এ মিলিত হয়। এটার নাম 'বায়োলজিকাল ডাইভারসিটি কনভেনশন'। কনভেনশন-এর সিদ্ধান্তে সই করে সম্মতি জানানোর ব্যবস্থা ছিলো রিও সম্মেলন চলাকালে। ঠিক হয়েছিলো 30টি দেশ সই করলেই এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু হবে। 14 জুন '92 পযন্ত 153 টা দেশ সই করেছে এই প্রস্তাবে।

বহু জাতের প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এদের অস্তিত্বের উপযোগী পরিমণ্ডল তথা নানান বাস্তুতন্ত্র (ecosystem)। এই বিলুপ্তি ও ধ্বংস ঠেকানোর উদ্দেশ্যে বায়োলজিকাল ডাইভারসিটি কনভেনশন।

যে প্রস্তাবগুলি নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে—
1) প্রতিটি দেশ তাদের নিজেদের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ বাঁচাতে

আইন তৈরী করবে; 2) কোনো দেশের কোনো প্রাইভেট কোম্পানি তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে যদি অন্য কোনো দেশে পরিবেশের ক্ষতি করে তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়বে প্রথম দেশের সরকারের ওপর; 3) যে দেশের প্রয়োজন সে দেশকে সস্তায় প্রযুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে—অবশ্যই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যা পেটেন্ট আইন না ভেঙে; 4) যে কোম্পানিগুলো জৈব-প্রযুক্তির biotechnology) সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্যে আলাদা আইন তৈরী করতে হবে; 5) যে কোনো দেশের জীন সম্পদ (genetic-material) যাতে অন্য দেশ ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে সর্ত ও পন্থা বার করতে হবে; 6) উন্নয়নশীল দেশের কাছ থেকে জিন সম্পদ উন্নত দেশ নিলে তার বিনিময়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কনভেনশন আরো মনে করে যে এ ব্যাপারে 1) শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য করা ছাড়াও নতুন প্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে 2) প্রতিটি দেশে একাধিক অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্বে থাকবে সেই দেশের সরকার; 3) সংরক্ষণ ঠিক মত হলে তার থেকে যে লাভ আসবে সেটা পাওয়ার অধিকারী হবে প্রাথমিক ভাবে স্থানীর মানুষ বা আদিবাসীরা—অর্থাৎ তারাই যারা যুগযুগ ধরে এখানকার বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদিকে রক্ষা করে এসেছে।

পৃথিবীতে যত ধরণের উদ্ভিদ, গাছপালা, প্রাণী আর জীবাণুর প্রজাতি আছে এবং এগুলো যে সব বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বেঁচে আছে বিজ্ঞানীরা এ সব কিছুকেই একসঙ্গে 'বায়োলজিকাল ডাইভারসিটি' বলেন। জিন প্রযুক্তির সাহায্যে যেসমস্ত নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণু মানুষ তৈরী করেছে সেগুলোর সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা না থাকলেও এগুলোকে সাধারণভাবে আলোচনার আওতার রাখা হয়েছে। এই কনভেনশন-এর লিখিত প্রস্তাবে কোথাও পৃথিবীর সমস্ত সংরক্ষিত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া নেই। যে যে দেশ এই প্রস্তাবে সই করবে তারা নিজেদের দেশের সংরক্ষিত অঞ্চলের তালিকা তৈরী করবে এবং সেগুলো নিয়েই তৈরী হবে পৃথিবীর সমস্ত সংরক্ষিত অঞ্চলের তালিকা।

FOREST PRINCIPLES

সারা পৃথিবীর সমস্ত অরণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও অব্যাহত উন্নয়নের প্রশ্নে একটা নীতি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। তার মুখবন্ধে খুব জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে—অরণ্যের বিষয়টার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সামগ্রিক পরিবেশ ও উন্নয়নের প্রসঙ্গগুলোর। অরণ্য নিয়ে ভাবতে গেলে পাশাপাশি সেখানকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অধিকারকেও মাথায় রাখতে হবে।

বিভিন্ন ধরণের অরণ্যের চরিত্র গড়ে উঠেছে নানান জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এইসব অরণ্য সম্পদের মধ্যে একদিকে যেমন আছে মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ অন্যদিকে আছে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার উপায়। তাই অরণ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সেই দেশের সরকার ও স্থানীয় অধিবাসীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ গোটা পরিবেশের কারণেই।

একদিকে অরণ্য জোগাচ্ছে নানা রসদ—অন্যদিকে অরণ্যেরও উন্নয়ন প্রয়োজন। এর জন্য অর্থ প্রয়োজন। ঠিক হয়েছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই অর্থের সংস্থান করা হবে এবং সাহায্য দেওয়া হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক বাস্তুতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সুনিশ্চিত করতেই অরণ্য সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। প্রয়োজন দূষণ, ক্ষতিকারক পোকামাকড় এবং বিভিন্ন অসুখের হাত থেকে অরণ্যকে বাঁচানোর।

স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করায় অরণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বুঝতে ও স্বীকার করতে বলা হয়েছে। এর ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু যেমন—বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল নদীগুলোর উৎস অঞ্চল watershed); পরিস্কার জলের ভাণ্ডার; জীন প্রযুক্তির দিক থেকে (গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎস (genetic material for biotech products); সবুজ পাতার সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপাদন ইত্যাদি। যে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে অনেকটা করে অরণ্য আছে এবং সেক্ষেত্রে যারা বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই অর্থ অরণ্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষদের বিকল্প জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা যাবে।

এই বনাঞ্চল সম্পর্কিত নীতিতে আরো বলা হয়েছে যে সারা পৃথিবীকে সবুজ করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। খুব খোলামেলা ভাবে উদ্যোগ ও কাজ শুরু হওয়া দরকার যাতে— যে সব বনাঞ্চল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলো রক্ষা করা যায়, নতুন বনাঞ্চল তৈরী করা যায় আর উপস্থিত বনাঞ্চলগুলোও সংরক্ষণ করা যায়। সমস্ত দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় নীতির নিরিখে অরণ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারবিধি স্থির করতে হবে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মাপকাঠি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভালো হয়। যে কোনো দেশের বনসম্পদ (উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ) অন্য কোন দেশ ব্যবহার করতে

পারবে কয়েকটা শর্ত মেনে নিয়ে। যেমন—(1) বনসম্পদ-এর ওপর সেই দেশের প্রাথমিক অধিকার, এবং সেই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করা চলবে না (2) বনসম্পদ ব্যবহার করতে গেলে কী ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে সে ব্যাপারে দুদেশকে একমত হতে হবে আর (3) সেই সম্পদ ব্যবহার করে যে লাভ হবে তাও দু'দেশের মধ্যে ভাগ করে নেবার বিষয়ে একমত হতে হবে। নিজেদের দেশের বনসম্পদ রক্ষা করা, সুপরিকল্পিত ভাবে বাড়ানো ও ঠিকমত দেখাশোনা করার জন্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন পরিবেশ-এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সঠিক প্রযুক্তি ও তা কাজে লাগানোর জন্যে নির্দিষ্ট তথ্য (Know how)। এইসব প্রযুক্তি ও তথ্যের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে সহজেই পরিচিত হয় এবং নিজেদের দেশে বিদেশী প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করার জন্যে নিয়ে আসতে পারে সে দিকে নজর রাখতে হবে। এ ধরণের প্রযুক্তি হস্তান্তর খুব লাভজনক সর্তে এমনকি অর্থনৈতিক ছাড় সমেত হওয়া উচিৎ। এটা করার জন্য উন্নত দেশগুলোকে উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ব্যবস্থা নিজেদেরই করে দিতে হবে promotion), খুব সহজেই যাতে হস্তান্তর হতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ধার দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

এছাড়াও, যে সব উন্নয়নশীল দেশ নিজের নিজের বনসম্পদ-এর সংরক্ষণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে, তাদের সাহায্য করতে হবে আন্তর্জাতিক মহলকেই। খেয়াল রাখতে হবে এইসব উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক ঋণের ভার কমানোর দিকটা। বিশেষ করে সেইসব উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যেখানকার বনসম্পদ উন্নত দেশ নিয়ে নেওয়ার ফলে বৈদেশিক ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে। চেষ্টা করতে হবে যে বনাঞ্চল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে যে ক্ষতি হবে তা যেন অর্থনৈতিকভাবে পুষিয়ে দেওয়া যায় বনসম্পদ থেকে তৈরী বিভিন্ন জিনিষপত্রর বাজার আরও বাড়ানোর মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে সেইসব দেশগুলিকে যারা বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতির (market economy) দিকে সরে আসার প্রক্রিয়ায় আছে।

AGENDA 21

পরিবেশ সুরক্ষা ও তার খরচ যোগানোর সমস্যার সাথে যুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই এজেন্ডা 21-এর অন্তর্ভুক্ত। বিকাশের লক্ষ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডকে নতুন রূপ দেওয়ার এ এক সার্বিক কর্মসূচী। যাতে পরিবেশের সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়, অথচ বিকাশের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকতে পারে। এইসব প্রস্তাব 40টা অধ্যায় ও 100-র উপর কাজের ক্ষেত্রে ভাগাভাগি করে উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন পদক্ষেপের ভিত্তি, উদ্দেশ্য, কি কি করতে হবে, কি কি উপায়ে করতে হবে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উপায়, খরচের সংস্থান এবং মূল্যায়ন ইত্যাদি।

এইসব পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে এজেন্ডা—21-এর কেন্দ্রীয় অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটা উচ্চ স্তরের কমিশন গঠন করবে।

আর্থিক সংস্থান ও ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে এজেন্ডা—21 রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রাদি সাধারণভাবে স্ব-স্ব দেশের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র থেকেই আসবে। তবে উন্নয়নশীল, বিশেষত সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে, বজায় রাখা যায় এমন বিকাশের জন্য অতিরিক্ত ও নতুন করে অর্থ সরবরাহের প্রয়োজন আছে। বাইরে থেকে এই অর্থ সংস্থানের প্রধান উৎস হবে 'সরকারী উন্নয়নমূলক সহায়তা' (Offiicial Developement Assistance—ODA)—যে অর্থ উন্নত দেশগুলি থেকে আসবে। এরা তাদের জাতীয় উৎপাদনের 0.7 শতাংশ অর্থ এই ভাণ্ডারে দেবে বলে অনেকে মেনে নিয়েছে। এই অতিরিক্ত ও নতুন অর্থ বরাদ্দের জন্য সমস্ত ধরণের বরাদ্দকারী সংস্থাগুলিকেই ব্যবহার করা হবে। যেমন—ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (IDA), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটি (GEF) ইত্যাদি। অব্যাহতভাবে চলতে পারে এমন বিকাশ প্রক্রিয়ার দিকে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে প্রস্তাবিত কমিশন সে সবের মূল্যায়ণ ও দেখাশুনো করবে।

এজেন্ডা—21-এর প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে, বিশেষ ভাবে বিকাশশীল দেশগুলিতে সহজ শর্তে পরিবেশের পক্ষে অনুকূল নতুন প্রযুক্তির স্থানান্তরীকরণ, আর্থিক সংস্থান ও উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। যে প্রযুক্তি দূষণ কম করবে, প্রাকৃতিক সম্পদ কম ধ্বংসাত্মক ভাবে ব্যবহার করবে, বর্জিত পদার্থগুলিকে কার্যকারীভাবে আবার ব্যবহার করবে, এবং ব্যবহার-অযোগ্য বর্জ্যপদার্থগুলির গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা করবে। অবশ্য এসব করতে গিয়ে একদিকে বৌদ্ধিক সম্পদের উপর অধিকার সুরক্ষার প্রশ্নটি এবং অন্যদিকে বিকাশশীল দেশগুলির বিশেষ প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখতে হবে।

এজেন্ডা—21-এর প্রথম অংশে, বজায় রাখা যাবে এমন বিকাশ প্রক্রিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলির দিকে নজর দেয়া হয়েছে। দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের চালু ছাঁদ-এর পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি, বিকাশ-কে পরিবেশের সাথে একীভূত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচী এই অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

24-টি অধ্যায় নিয়ে তৈরী এর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কথা। সেই প্রসঙ্গে যেসব বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে বায়ুমণ্ডল, নদী ও সাগর সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্ন জলের উপযুক্ত মান ও মাত্রায় সরবরাহ, বনভূমি

সংরক্ষণ, মরু সম্প্রসারণ রোধ এবং খরার বিরুদ্ধে লড়াই, গ্রাম ও পর্বতাঞ্চলে অব্যাহত বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা করা এবং প্রাণ বৈচিত্র্যের সুরক্ষা। এছাড়াও জীবপ্রযুক্তি বিদ্যা (Bio-technology) এবং বিষাক্ত রাসায়নিক তেজস্ক্রিয় ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ ও তাদের বেআইনী আন্তর্জাতিক চালান সংক্রান্ত নানান বিষয় এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

এইসব লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য এজেন্ডা 21 সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এদের মধ্যে আছে নারী, শিশু, বিভিন্ন ভূখন্ডের আদি অধিবাসী ও তাঁদের সম্প্রদায়, বে-সরকারী সংস্থাসমূহ, শ্রমিক ও তাঁদের ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠী, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ গোষ্ঠী এবং কৃষকরা। এজেন্ডাকে কার্যকর করার জন্য অব্যাহত বিকাশ উদ্যোগের উপযোগী বিজ্ঞান চর্চার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও বিকাশশীল দেশগুলিতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এবং দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানোর ব্যাপারেও সুপারিশ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত অধ্যায়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে, পরিবেশ ও বিকাশের প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্র এক আন্তর্জাতিক অংশীদারীত্বের সিদ্ধান্ত নিয়েছে—যাতে, আরও কার্যকরী ও সমাদর্শী বিশ্ব অর্থব্যবস্থা অর্জন করা যায়।...আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশগুলির জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থান ও তার ঠিকমত ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলে বলা হয়েছে। উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা যেন নিজেদের দেশে ও উন্নতশীল দেশে ধারাবাহিকতা রাখার মত বিকাশ প্রক্রিয়াকে সহায়তা দেন।' সেজন্য তাদের নীতিসমূহের সংস্কার ও অদল বদল করা দরকার, সঞ্চয়ের হারও বাড়ান দরকার।

দারিদ্র বিরোধী লড়াই সংক্রান্ত অধ্যায়ে দরিদ্রদের স্থায়ী জীবিকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আহ্বান রাখা হয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মর্যাদা, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ—এর সাথে সঙ্গতি রেখে যেন জনসংখ্যা রোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সন্তান সংখ্যা এবং দুই সন্তান জন্মের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান নির্ধারণের মত ব্যাপারে মাতা পিতা উভয়ের মতামত সমমর্যাদার সাথে যেন বিবেচিত হয়।

এজেন্ডা 21-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে একদিকে দুনিয়ার কোন কোন অংশে অর্থাৎ ধনী দেশগুলিতে অতি উচ্চ হারে ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে মানবজাতির এক বিরাট অংশ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় চিকিৎসা পাচ্ছে না। ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহারের ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা বদলাতে হলে বহুমুখী পরিকল্পনা প্রয়োজন।

বায়ুমন্ডল সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের বয়ান রচনার ক্ষেত্রে ঐক্য মতে পৌঁছাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অংশ শুরু হয়েছে আবহাওয়া নিয়ে। এতে আরও যে যে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে শক্তির উৎসগুলির বিকাশ, বায়ু মন্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষয়, দুই দেশের সীমান্তের এপাশে ওপাশে বায়ুদূষণ, ইত্যাদি। বলা হয়েছে দুনিয়া জুড়ে যেভাবে শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার করা হচ্ছে তার অনেকটাই আর বজায় রাখা যাবে না। বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাস ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্যের পরিমাণ কমাতে হবে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যান্য পরিবেশের পক্ষে অনুকুল শক্তির উপর আরো বেশী বেশী করে নির্ভর করতে হবে।

সম্প্রসারণ রোধ করা এবং খরা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য বসুন্ধরা সম্মেলন জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ করেছে যে পরিষদ যেন তার পরবর্তী সম্মেলনে একটি আন্তরাষ্ট্র পর্যালোচনা কমিটি স্থাপন করে। জুন 1994-এর মধ্যে অন্তত আফ্রিকার দেশগুলিতে খরার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া মহাসাগর গুলির সুরক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ে মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণের ব্যাপারে নানা সুপারিশ করা হয়েছে। এজেন্ডা 21-এর ভূমিকাতে বলা হয়েছে—"সমস্ত মানবজাতি ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে। যদি আমরা বিকাশ ও পরিবেশের সমস্যাকে একটা অখন্ড সমস্যা হিসেবে দেখতে শিখি ও সেদিকে আরও নজর দিই, তবেই আমাদের মৌলিক সমস্যাগুলি মিটতে পারে। কোনও জাতিই একা একাজ করতে পারবে না। কিন্তু সবাই মিলে পারি।"

1972 সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে গৃহীত সনদের সংক্ষেপিত অনুবাদের জন্য দেখুন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মে-জুন, 1983 সংখ্যা

গ্লোবালফোরাম

অন্য বসুন্ধরা বৈঠক

কোষ্টা-রিকার সমুদ্রতট থেকে আদিবাসীদের হঠিয়ে দিয়ে নির্মিত হচ্ছে এক মনোরম পর্যটন আবাস। মালিক কানাডাবাসী এক কোটিপতি। নাম মরিস স্ট্রং। হ্যাঁ ইনিই সেই মহানুভব যিনি UNCED-এর সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত হয়েছেন। সুতরাং রিও-সেন্ট্রোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে এঁর ও এঁদের সম-পর্যায়ের মানুষদের প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বা তাকে কলুষমুক্ত রাখার হাজার পরিকল্পনা যে নির্ভেজাল ভণ্ডামী তা বুঝতে বাকি থাকে না। যে কমল নাথ বসুন্ধরা বৈঠকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে নিজেকে সেরা প্রতিপন্ন করার জন্য আসরে অসি আস্ফালন করে এলেন তাঁর দেশে কি ঘটছে? মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলার পরিবেশ আন্দোলনের প্রবীণ নেতা শ্রীব্রহ্মদেব শর্মাকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে উলঙ্গ করে জগদ্দলপুর শহরের রাজপথে ঘোরানো হল। খবর কি পর্যাবরণ ভবনে পৌঁছায় নি? হায় কমলনাথ! লেবু কচলে কি হবে? বরং চলুন যাওয়া যাক পার্কে। হ্যাঁ, ফ্লেমিংগো পার্কে।

মংগলবার, জুন '92। দ্বিতীয় দিন। দক্ষিণ অতলান্তিকের শীতল বাতাস গা জুড়িয়ে দিচ্ছে। হাজার হাজার বৃদ্ধ-যুবা-শিশু অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। এজেন্ট 007 খ্যাত চিত্রতারকা রজার মুর ঐ তো দাঁড়িয়ে। ঐ দেখা যাচ্ছে সাদা পাল। অতলান্তিকের বাতাসে কেমন ভেসে আসছে গেইয়া। গ্রীক পুরাণ বলে গেইয়া হচ্ছেন দেবী—এই পৃথিবীর। গেইয়া যাত্রা শুরু করেছিল দুবছর আগে। নরওয়ে থেকে। মোট 17000 মাইল সামুদ্রিক জলযাত্রা করে আজ গেইয়া পৌঁছে গেল রিওতে। 30টি বন্দরে নোঙর ফেলেছে। এনেছে চিঠি। হাজার হাজার শিশুর, ছোটোর দাবী, বাঁচাতে হবে গ্রহটাকে। তীরে দাঁড়িয়ে থাকা কচি কচি হাতগুলোতে লাটাই। আকাশ ছেয়ে গেল রঙীন ঘুড়িতে। গেইয়ার পিঞ্জরে শিহরণ। গেইয়ার মাথার উপরে উড়ছে হেলিকপটার। সতর্ক এবং উদ্বিগ্ন। 1200 পরিবেশপ্রেমীর উষ্ণ অভ্যর্থনায় স্নাত হয়ে গেইয়া নোঙর ফেললো। তীরে আগে থেকেই নির্মিত হয়েছিল এক কৃত্রিম বৃক্ষ—জীবনবৃক্ষ তার নাম। গেইয়ার সংগ্রহ করে আনা শিশুদের লেখা চিঠি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো জীবনবৃক্ষে। সে চিঠির বুকের ভাষায় একটু কান পাতা যাক। বড়োরা বসছে পরিবেশ নিয়ে বিশ্ব-সম্মেলনে। বড়োদের কাছে প্রার্থনা করছে শিশুরা। মনে যেন থাকে বাঁচাতে হবে অরণ্য। বাতাসে যেন না ছড়ায় বিষ। সুন্দর পৃথিবীর বক্ষের স্পন্দনটি থামিয়ে দিও না। আমাদেরকে শুধু দেখলে হবে না—শুনতে হবে আমাদের কথা। রিওর সমুদ্রতটে ফ্লেমিংগো পার্কের মাঝে দাঁড়িয়ে ড্যানী কেনেডী। কেনেডী এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। কেনেডী বলছে, যে সব যৌবন 25 অতিক্রম করে নি, সারা বিশ্বে তাদের সংখ্যা দুশ কোটি। আর পনেরর নিচে আছে এমন কিশোর-কিশোরী সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। কাজেই শুনতে হবে আমাদের কথা।

আমরা মানব-সমাজের যৌবন। আমাদের চোখ মানব-সমাজের চোখ। আমাদের বক্ষে কান পেতে অনেক কথা শুনতে পায় মানব-সমাজ। কি ব্যাপার? ওখানে কি হচ্ছে? বেলুন। 40 ফুট লম্বা। গায়ে তার লেখা—"আশার বিন্দু"। দু বছর ধরে ঘুরে বেড়াবে নানা দেশের আকাশে। 1972 সালে ষ্টকহোমে বসেছিল প্রথম বিশ্ব-পরিবেশ সম্মেলন। 20 বছর পরে আবার বসছে তা রিও-ডি-জেনেইরো শহরে। সরকারী এই বিশ্ব-সম্মেলনের আয়োজন করেছে জাতিসংঘের United Nations Conference on Environment & Development সংক্ষেপে UNCED। অন্য একটি নামও আছে—EW-92-এই সম্মেলনের। যাই হোক সরকারী এই সম্মেলনের পাশাপাশি বসছে Global Forum—বেসরকারী সংগঠনদের, যাদের কর্মসূচী পরিবেশ-ভিত্তিক বা মানবকল্যানভিত্তিক তাদেরই জন্য এই আয়োজন। সরকারী অনুষ্ঠানের স্থান রিও সেন্ট্রো। এঁদের অনুষ্ঠানের স্থান ফ্লেমিংগো পার্ক। দক্ষিণ আটলান্টিকের সমুদ্রতট ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে অবস্থান এই জায়গাটির। সেই Global Forum এর প্রাক্ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চিহ্নিত হয়ে গেল পৃথিবীর দেবীর নামাঙ্কিত জাহাজ গেইয়ার আগমনে। আর এই গেইয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে এত কান্ড।

Global Forumএ যোগ দিতে আসা 12000 প্রতিনিধি ব্রাজিলের প্রশাসনের কাছে প্রথমেই এমন এক আপ্যায়ন পেয়েছে যাকে মনোরম বলা চলে না। কলুষিত পৃথিবীর প্রতীক হিসাবে স্থানীয় এক জঞ্জালের ডোবা থেকে তুলে আনা প্রচুর আবর্জনা দিয়ে নির্মিত হয়েছিল "Garbage Planet" বসুন্ধরা সম্মেলনের রাস্তায়। স্থানীয় পুলিশ তা অনুমোদন করে নি। 164টি দেশের মানুষকে সেই সব আবর্জনা আবার সেই পূর্বের স্থানে রেখে আসতে হয়েছে। 3রা জুন সারারাত ধরে উৎসব। Global Forumএর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মহিলারাও রাত জেগে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। World Wide Fund

for Nature (WWF) আকাশে উড়িয়ে দিল বিশাল এক বেলুন। তার গায়ে লেখা "কাজ চাই, গরম গরম কথা নয়।"

এত কাণ্ড চলছে। পয়সা আসছে কোথা থেকে? কত তার পরিমাণ? দিচ্ছে Global Forum। মোট 11 মিলিয়ন অর্থাৎ 1 কোটি 10 লক্ষ মার্কিন ডলার। 4ঠা জুন যখন রিও সেন্ট্রোতে চলছে রাজনীতির লড়াই, তখন ফ্লেমিংগো পার্কে প্রচণ্ড অর্থাভাব। ঠিকাদার এসে হুঁসিয়ারী দিচ্ছে। তাঁর দাবী 48 ঘণ্টার মধ্যে দেনা শোধ করতে হবে। ইতিপূর্বেই 2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেনা হয়ে গেছে। তার উপর ঠিকাদারের হাতে রসিদ 11·6 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। প্রধান সংগঠক Warren Linder মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। ব্যাকুল আবেদন সাংবাদিকদের কাছেও। এক মহিলা উদ্যোক্তা নিজের মাথার টুপি খুলে অর্থ সংগ্রহে নামলেন। উলটানো টুপিতে কিছু পড়ল বটে। গুণে দেখা গেল মাত্র 20 মার্কিন ডলার। তবে প্রতিশ্রুতি এলো অনেক। 6ই জুন ঘটলো আর এক ভয়ানক ব্যাপার। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক সংগঠন ব্রাজিলের পুলিশের কাছে অভিযোগ করল যে ওয়ারেন লিন্ডার তার নিজের সংগঠন Centre for our Common Future কে গোপনে দিয়েছেন মোট 1·7 মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিব্রত প্রধান সংগঠক জানালেন—'পরীক্ষা করে হিসাব-নিকাশ দেওয়া হবে। নিজের সংগঠনের জন্য কিছুই হাতাই নি। প্রতিটি সেন্ট খরচ হয়েছে Globol Forum এর কাজে।' সমস্যা আরো ঘনীভূত হচ্ছে। UNDP-র প্রধান William Draper এবং Maurice Strong আর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি নিয়ে আলোচনা হলো। ফল হলো না। অবশেষে বহু চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত হয়েছে কিছু। সেই উদ্বৃত্ত অর্থে ফ্লেমিংগো পার্কে বসান হবে সবুজ ঘাস।

অর্থের কথা থাক। এবার পরমার্থের কথায় আসা যাক। বিশ্বের এ যাবৎ অনুষ্ঠিত বৃহত্তম বেসরকারী সংগঠনগুলির সম্মেলন Global Forum এ যোগ দিয়েছে 2000 এর অধিক সংস্থার প্রতিনিধি। বিশাল তাদের বৈচিত্র্য। আনন্দমার্গী ছিল। ব্রহ্মকুমারী ছিল। ছিল আমাজন অববাহিকার আদিবাসীরা। ছিল নিরামিষ ভোজীদের সংগঠন। ছিল নব্য ম্যালথুস মতবাদীরা। ছিল নারীমুক্তি নিয়ে সংগ্রামে রত সংগঠন। ছিল শিশু-কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করে এমন সংস্থা। আরো কত! বৈচিত্র্যের নেই শেষ। আমাদের দেশ থেকে যে সব সংগঠন গিয়েছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী চিমন ভাই প্যাটেলের মদত পুষ্ট। নেতৃত্ব দিতে উপস্থিত ছিলেন গুজরাট রাজ্য সরকারের বড় আমলা জি. সি. প্যাটেল। আমলা মহাশয়ের সাথে গিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর গৃহিণী। এঁদের কাজ ছিল Global Forum এর কাছে বুঝিয়ে বলা কেন নর্মদা প্রকল্প সঠিক। এখানে যেমন কড়া ভাষণ আছে তেমনি আছে মিঠে সংগীতের মূর্চ্ছনা। আছে কৃত্রিম জবিন বৃক্ষ বিরাট বিরাট গাছের পাতার কাট-আউটে উৎকীর্ণ—পৃথিবীর সন্তান আমরা। গ্রহটাকে হবে বাঁচাতে। বিরাট এক ক্রশ পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নিঃসঙ্গী মানুষ। বিপন্ন ধরণীর প্রতীক যেন।

উত্তরের সংগঠনগুলি দেখা গেল অনেক সংগঠিত। নিজের নিজের দেশের সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করে কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করছেন। প্রত্যহ কাগজে বিবৃতি দিচ্ছেন। তুলনায় দক্ষিণের সংগঠনগুলি কিছুটা ম্লান। জাপানী সংগঠনগুলির মত আমাদের দেশের সংগঠনগুলি ভাবছে আরো প্রস্তুতি নিয়ে এলে ভাল হত। ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসেছেন রীতা ক্লীজেক। কৃষি উন্নয়ন তাঁর সংগঠনের বিষয়। নানা সংগঠনের সাথে আলোচনা চালাচ্ছেন তাঁর বিষয় নিয়ে। তাঁর বক্তব্য—কৃষি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিও সেন্ট্রো থেকে শেখার কিছু নেই, আছে আমাদের এই Global Forum এ বরং। প্রচণ্ড ব্যস্ততা মহিলা শিবিরে। তাঁরাও বুঝেছেন একথা যে UNCED-এর Eco-92 র বাগাড়ম্বর তাঁদের কোন কাজে আসবে না। খোদ ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে এসেছেন ড্যানা এ্যাস্টন। তাঁর সংগঠন "পিপ্‌ল অফ কালার"। তিনি বললেন —ওঁদের (আমেরিকার অন্যান্য সংগঠনের) নীতি আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর।

হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে Global Forum-এ উপস্থিত হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। দীর্ঘ সময় কাটালেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়। কিন্তু সংগঠন গুলি তার উপরে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হল।

এর আগে এসেছিলেন এ্যাল গোরে। সংগে এসেছেন মার্কিন সেনেটররা। Global Forum-এ দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইলেন মার্কিন মুলুকের আদিবাসীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য। স্বীকার করলেন আদিম সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।

Global Frum-এ এলেন পূর্বতন সোবিয়েত প্রধান মিখাইল গর্বাচভ। তিনি সম্মতি দিয়েছেন International Green Cross নামের সংগঠনের সভাপতি হতে। এই সংগঠন নানাভাবে প্রকৃতি-পরিবেশ বাঁচাতে আগ্রহী। তাঁরা তৈরী করবেন Shock Troop বা আঘাত বাহিনী, যার কাজ হবে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে ঘটে যাওয়া পরিবেশগত দুর্ঘটনার ফলে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

Global Forum এ মজার এক ঘটনা ঘটে গেল দশই জুন। বসুন্ধরা সম্মেলনে নিকৃষ্টতম কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কার পেলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং জন মেজরের দেশ। ওদিকে থরথর করে কেঁপে উঠছে ব্রজিলের রাজধানী। 50,000 উচ্চ কণ্ঠস্বর রাজপথের মিছিল থেকে জানতে চাইছে—তাদের উপর দমন-পীড়ন

চালিয়ে এ পরিবেশ সম্মেলনের সার্থকতা কি? তারা ধিক্কার জানাচ্ছে আমেরিকাকে, বিশ্ব-ব্যাংককে। সরকারী সম্মেলন নিয়ে প্রচণ্ড অসন্তোষ Global Forum এর প্রতিনিধিদের মধ্যে। তাঁরা বলেছেন—

লক্ষ্য রয়ে গেল দূরে
সুযোগ গেল হারিয়ে।

উত্তরের সংগে দক্ষিণের মন কষাকষি Global Forum এও ঘটেছে। এখানে এসে অনেক পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করেছেন সংগঠনগুলির এক মহাদেশগত পার্থক্য, কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে। তাঁরা বলছেন —Global Forum-এ এসে

আফ্রিকার মানুষেরা দেখেছেন
এশিয়ার মানুষেরা শুনেছেন
ল্যাটিন আমেরিকার মানুষেরা কথা বলেছেন
ইয়োরোপ আমেরিকার মানুষেরা কাজ করেছেন।

অবশ্য এটি খুব সরলীকৃত এক রসিকতা। যাই হোক এটা দাবী করা হয়েছে যে নির্দিষ্ট ফলাফল চাক্ষুষ করা না গেলেও অগ্রগতি হয়েছে এবং তা যথেষ্ট।

অবশ্য Global Forum এর প্রধান উদ্যোক্তা Warren Lindar বলেন—বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা যেন নিকৃষ্টতর জীব। রাষ্ট্র-প্রধানদের সাথে মানবিক সংযোগের সুযোগ পান নি তাঁরা। রাষ্ট্র-প্রধানদের নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে। তবে তা নিয়ে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি হয়েছে। 35000 ব্রাজিল পুলিশ আর 100 জন রাষ্ট্র-সংঘের নিরাপত্তাকর্মী মিলে বাস্তবিক দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে রেখেছিল রাষ্ট্রনেতাদের। দিনের আলোর মত এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ফ্লেমিংগো পার্কের চিন্তাধারা রিওসেন্ট্রোর নিরাপত্তার প্রাচীর লঙ্ঘন করতে পারেনি। তবে একটি বিষয় স্বীকার করতে হবে। Global Forum-এ মহিলাদের বিরাট এক জয় হয়েছে। সরকারী সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছে এজেন্ডা 21। সেই কর্মসূচীর 24 নং অধ্যায় নারী উন্নয়ন কেন্দ্রিক। এটি নিয়ে Global Forum এ প্রচণ্ড বিতর্ক হয় এবং নারী-প্রতিনিধিদের জয়ের সূচনা হয়। কর্মসূচী-21 সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁদের প্রস্তাবিত নতুন 6 দফা কর্মসূচীতে। ওগুলি মূল কর্মসূচীতে আগে ছিল না। এগুলি সংক্ষেপে এই রকম।

(1) দক্ষিণের ঋণ উত্তরকে মকুব করতে হবে। এতে যেন দক্ষিণের দরিদ্র-সমাজ উপকৃত হয়।

(2) নারীকল্যাণ ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য যে ঋণ বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার দেবে, তাতে কোন শর্ত আরোপ করা চলবে না।

(3) মহাকাশকে সামরিকক্ষেত্রের বাইরে রাখতে হবে। রাসায়নিক, জৈব ও পারমানবিক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা ও প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থ দ্বারা পরিবেশ বিনষ্ট করা চলবে না।

(4) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার প্রয়োগ যেন মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশের ক্ষতি না করে।

(5) জৈবিক আশা-আকাংখা ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করা চলবে না।

(6) কর্কটরোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন দূষণকারী বস্তু থেকে আবহাওয়াকে মুক্ত করতে হবে।

Global Forum যদিও ছিল মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বিতর্কের ঝড় তবুও 30 টি চুক্তি হয়েছে। অবশ্য পরিবেশ ও উন্নয়ন ভিত্তিক সেই সব চুক্তি। বহু পরিবেশগত দিক আছে সেই সব চুক্তিতে। যেমন জীব-বৈচিত্র্য, অরণ্য সৃজন শক্তি, পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা। আছে উন্নয়নের দিকও। যেমন বিকল্প অর্থনীতির মডেল, নগরায়ণ এবং সমরব্যবস্থা।

এ ছাড়াও Global Forum এ বেসরকারী সংগঠনগুলি মিলে তৈরী করেছে বিশ্বদলিল (Earth Charter) —মূলতঃ যা হচ্ছে আটটি গৃহীত নীতির সমাহার। সংক্ষেপে সেগুলিঃ

(1) বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রের সংহতির প্রতি নজর রাখতে হবে।

(2) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি সমূহের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলতে হবে। অগ্রাধিকার দিতে হবে মৌলিক পরিবেশগত দিককে।

(3) উৎপাদন ও ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে অসহনশীল (Unsustainable) নীতি পরিহার করতে হবে।

(4) পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের প্রণালী ও বাস্তবতা রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

(5) সামরিক শক্তির ব্যবস্থাপনা ব্যবহার ও বিরোধের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাপ প্রত্যাহার করতে হবে।

(6) পরিবেশের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও তার সমস্যা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে এবং তাতে যেন সংশ্লিষ্ট জনগণকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

(7) উত্তরের দেশগুলি দক্ষিণের দেশগুলির কাছে পরিবেশ ঋণে আবদ্ধ। অর্থ ও প্রযুক্তি দিয়ে মুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

(8) পুরুষ- শাসিত সমাজের পরিবর্তে আমরা চাই এমন এক সমাজ যেখানে মানবিক ও পরিবেশগত কল্যাণে নারী পুরুষ উভয়েরই অবদান থাকবে।

সবশেষে বলা হয়েছে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পৃথিবীর জীবন মণ্ডলের উপর অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে গিয়েছে যে আর নীরব থাকা উচিত হবে না।

Down to Earth পত্রিকার 15ই জুলাই 1992 সংখ্যার সহায়তায় প্রতিবেদনটি তৈরী করেছেন বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত।

নাটকীয় পরিবেশ

পরিবেশ নিয়ে সবাই বলছেন। উদ্বেগ জানাচ্ছেন। ভুক্তভোগীরা তো বটেই। এই বিপদের জন্য দায়ী যারা তাঁরাও। বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পদে। নমুনা হিসেবে একটি পরিবেশ মহাসম্মেলনের কল্পনা করা হয়েছে। দুই স্তরে সম্মেলন। একটি আন্তর্জাতিক স্তরে। অন্যটি জাতীয় স্তরে। সেখানে বিভিন্ন পক্ষ তাদের বক্তব্য হাজির করছেন। কিছু কণ্ঠস্বর চেনা মনে হতে পারে। তবে গোটাটাই কাল্পনিক।

পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

প্রথম বক্তা : জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি

শোনো বিশ্বজন, আমাদের প্রিয় পৃথিবী আজ বিপন্ন। জল-স্থল অন্তরীক্ষ হয়েছে বিষময়। কোটি কোটি হেক্টর বনজঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। ক্রান্তীয় বনাঞ্চল উল্লেখযোগ্যরকম কমে গেছে। বহু জায়গায় মাটি হয়ে পড়েছে অনুর্বর, বন্ধ্যা ; মরুভূমির প্রসার ঘটছে। সূর্যের অতিবেগুণী রশ্মির আচ্ছাদন ক্ষীণ ওজোনস্তর ক্ষীণতর হয়ে আসছে, কোথাও কোথাও তাতে দেখা দিচ্ছে ছিদ্র এবং তা বেড়ে যাচ্ছে। ত্বকের ক্যানসারও তাই উর্ধ্বমুখী।...পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। প্রাণী ও উদ্ভিদকুল বিপন্ন ; 20,000 জীবপ্রজাতি ধ্বংসোন্মুখ। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ার জন্য দায়ী যেসব গ্রীণহাউস গ্যাস, তাদের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও মিথেনই প্রধান। বর্তমানে এইসব গ্যাসের তুলনামূলক প্রভাবও আমরা হিসেব করেছি। এখন পর্যন্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রধান দোষী, তার প্রভাব 57 শতাংশ, নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলির প্রভাব 21 শতাংশ। এবং মিথেন 15 শতাংশ। বাকীটা অন্যান্য গ্যাসের অবদান। ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে 1987 সালে পৃথিবী জুড়ে জ্বালানী পুড়িয়ে গড়ে বার্ষিক মাথাপিছু 1.7 টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছাড়া হয়েছে। তবে শিল্পোন্নত দেশগুলোই এর জন্য বেশী দায়ী। আমেরিকা মাথাপিছু ঐ বছরে গড়ে 5 টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশিয়েছে, ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই গড় 2.5 টন আর ভারতের মত দেশে মাথাপিছু গড় মাত্র 0.4 টন। ওজোন স্তরে ক্ষতির জন্য ক্লোরোফ্লুরো হাইড্রোকার্বন যৌগগুলির ভূমিকাও স্পষ্টতর হয়েছে। এব্যাপারেও শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।

এক্ষুনি যদি আমরা সম্মিলিতভাবে এই ধ্বংসের গতিকে রুদ্ধ-স্তব্ধ করতে না পারি তো পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। সত্যি কথা, আজও পৃথিবীর বহুসংখ্যক মানুষ গৃহহীন, রোগজীর্ণ, অভুক্ত অর্ধভুক্ত। তাদের সেসব ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে হবে, উন্নয়নের গতি বাড়াতে হবে। পরিবেশকে ধ্বংস করে আমরা তা করতে পারব না। পরিবেশ-সুরক্ষা এবং উন্নয়ন যে পরস্পরবিরোধী নয় এটাই আজ আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। দুঃখের কথা, এতদিন ধরে শিল্পোন্নত দেশগুলির অনুসৃত উন্নয়নের পন্থা-পদ্ধতি পরিবেশের সুরক্ষার কথা ভাবেনি ; তাদের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি হবে আত্মহত্যার সামিল। অনুন্নত দেশগুলির পরিবেশ-বিধ্বংসী উন্নয়নের পথ পরিহার করে পরিবেশ-সহায়ক পথ গ্রহণ করলে সকলেরই মঙ্গল। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলিকেও তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তা দুই : শিল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধি (সরকারী)

সবার সঙ্গে পৃথিবী বাঁচানোর দায়দায়িত্ব ভাগ করে নিতে আমরা প্রস্তুত। যেসব অঙ্গীকার আমরা করব, যেসব সাধারণ কর্মসূচী আমরা নিতে চাইব, সেগুলি পালনে আমাদের এক যোগে তৎপর হতে হবে। দেখতে হবে এক দেশের কাজের ফল অন্য দেশের উন্নয়ন বা পরিবেশ যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবানুগ। এটা ঠিকই যে কিছু কিছু দেশের মাথাপিছু আয় ও ভোগ বেশী। কিন্তু গরীব দেশগুলোকে বঞ্চিত করে, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে আমরা তা করেছি এমন একপেশে মতবাদ মানতে পারিনা। তাহলে আমাদের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোগী তথা সাধারণ মানুষের উদ্যোগ-উদ্যম-উদ্ভাবনীশক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়। সব মানুষের উন্নতি আমাদের কাম্য কিন্তু তারজন্য আমাদের উন্নতি ছেঁটে ফেলতে হবে এমন দৃষ্টিভঙ্গী অবাস্তব এবং যৌথভাবনার পরিপন্থী।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমরাও উদ্বিগ্ন। অবাধ গবেষণা-নতুন অজানা প্রজাতি চিহ্নিতকরণ, ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নানাদিকে উদ্ভাবন—এসব করতে হবে। কিন্তু অনেক অনেক দেশে দ্রুত জনসংখ্যা ও দারিদ্র বেড়ে যাবে আর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্যের উপকরণ ও পন্থা তাদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দিতে হবে—এটা মোটেই বাস্তবসম্মত

নয়। এমনটা হলে অনেক দেশের অনেক মানুষের সৃজনশীলতা ব্যাহত হবে। উদ্যোগ নেবার স্পৃহা কমে যাবে—সেটা কখনই কাম্য নয়। তাই আমরা চাই, স্বত্বস্বীকার করা হোক। ভবিষ্যতে ব্যবহার্য যেসব নতুন উপকরণ ও পথ পৃথিবীর জীবপ্রজাতি থেকে গবেষণা করে পাওয়া যাবে তাতে গবেষকের স্বত্ব থাকা একান্ত জরুরী। অবশ্য সব দেশের গবেষকদেরই এতে থাকবে সমান অধিকার।

পৃথিবীর বনভূমি রক্ষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আমরা বেশী খরচ করতে রাজি আছি কিন্তু গবেষণা করার, নতুন নতুন প্রোডাক্ট প্রস্তুত করার ও সেসবের স্বত্ব বিক্রী করার অধিকার বজায় রাখা দরকার। এখনও হয়তো কার্বন ডাইঅক্সাইডই প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস। কিন্তু যে হারে কিছু কিছু দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, বন কেটে জমি হাসিল করা হচ্ছে, বিশেষত বেশী জলের ফসল—ধানচাষ বাড়ছে এবং সেইসঙ্গে গ্রীণহাউস গ্যাস মিথেন মিশছে বাতাসে তাতে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছিনা। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো মিথেনই প্রধান গ্রীণহাউস গ্যাস হয়ে দাঁড়াবে। সম্ভবনা আরও প্রবল এই কারণে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড CFC ইত্যাদির নির্গমন কমাতে আমরা কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছি। বস্তুত 1989 সালের তুলনায় 1991-এ আমরা এসব গ্যাসের নির্গমন 10 থেকে 70 শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে ফেলেছি এবং তা অগ্রগতির হার বাড়িয়েই। কাজেই 1990 সালের মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের সীমা 2000 সালেও রাখতে হবে—এমন বাঁধাবাঁধির কোন প্রয়োজন আমরা দেখছিনা। বাস্তবে হয়তো আমরা তার থেকেও কম করে ফেলব। তবে অন্যদেরও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে অন্যান্য গ্রীণহাউস গ্যাসের প্রকোপ কমবে।

বক্তা তিন: উন্নত দেশের শিল্প প্রতিনিধি (বেসরকারী)

বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে বিশ্বের মানুষ এক জায়গায় আলোচনা করছেন—এ খুবই আশার কথা। আর এটাও আশা ও আনন্দের ব্যাপার যে পরিবেশপ্রেমীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে তাঁরা যে পরিমাণ ভীতি ছড়াচ্ছেন সেটা কতটা যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত তা খতিয়ে দেখা দরকার। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই একমত নন এখনও। তবুও এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে আমরা কোন চান্স নিতে পারি না। সাবধান হতেই হবে। কিন্তু শুধুমাত্র আবেগ উদ্বেগ সদিচ্ছা দিয়ে তো পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা যাবে না, তার জন্য চাই কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা এবং অর্থ। সেসব যত্রতত্র পাওয়া যাবে না। আর এও ভুলে গেলে ক্ষতিই হবে আমাদের যে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যেসব অগ্রগতির জন্য আজ আমরা এতগুলি দেশের এতগুলি মানুষ এক জায়গায় জড়ো হতে পেরেছি, মতবিনিময় করতে পারছি, তার ভিতকে দুর্বল করে আমরা একপাও এগোতে পারব না। কাজেই আমাদের শিল্প, কারিগরি প্রয়োগের প্রয়াসকে খর্ব করার যে কোন চেষ্টাই আখেরে পরিবেশেরই ক্ষতি ডেকে আনবে।.....দূষণ হীন বা ন্যূনতম দূষণের বিনিময়ে উৎপাদনের জন্য প্রচুর গবেষণা, প্রচুর অর্থব্যয় আমরা করছি। ফলে আমরা বাজারজাত করতে পারছি এমন সব পণ্য যেগুলি eco friendly। ভবিষ্যতে এ ধরণের পণ্যের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এইসব পণ্যই যাতে গৃহীত হয় সে চেষ্টাই সকলের করা উচিত। পুনরুক্তিদোষ মার্জনা করবেন—পৃথিবী নামক জৈবাধার গ্রহ যে একটাই এ আমরা সম্যক জানি। তাই আমরা চাইব যে এই পৃথিবীর তাবৎ সরকারী বনভূমি সমগ্র পৃথিবীবাসীর বলে ঘোষণা করা হোক এবং তার সংরক্ষণ দায়িত্বে থাকুক আন্তর্জাতিক কোন সংগঠন। সব দেশের বিজ্ঞানী গবেষকদের থাকুক সেখানে অবাধ অধিকার, যাতে তাঁরা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির ধ্বংস হবার পথ রুদ্ধ করতে পারেন; মানুষের কল্যাণে সেগুলিকে কাজে লাগাবার পন্থা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের শোষণে এই সংরক্ষিত বনভূমিই হবে সবচেয়ে কার্যকরী।

আর একটি বিষয়েও আমি সুধী বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোথাও কোথাও পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা একটা বিশ্বাস, একটা মৌলবাদী রূপ নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদী মৌলবাদের মতই এটা ভয়ংকর রূপও নিতে পারে। পরিবেশ-বিশ্বাসের প্রবক্তারা একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাদের ধ্বংস চায়। এমনকি ব্যক্তিগত আক্রমণও হতে পারে। এ এক বিপজ্জনক প্রবণতা। একটি জটিল সমস্যার গভীরে ঢোকার চেষ্টা না করে মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় বা জাতীয় উন্মাদনার সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের সস্তা স্লোগান তোলার ব্যাপারে সকলের সচেতন থাকা উচিত এবং প্রতিরোধ করা উচিত বলেই আমি মনে করি। পরিবেশ সুরক্ষার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসব করতে হবে।

বক্তা চার: তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি (সরকারী)

আপনারা সকলে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধি মশায়ের বক্তব্য শুনেছেন। তিনি বলেছেন পৃথিবী বিপন্ন। আমি তার সঙ্গে যোগ করব এ আমাদের সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে বড় লজ্জারও। গাছ পালা পশুপাখি যদি এ সভায় উপস্থিত থেকে তাদের কথা বলতে পারতো আমরা হয়তো মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত হতাম। পারস্পরিক দোষারোপ করতে নয়, তথ্যের খাতিরে সত্যের প্রয়োজনে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার তাগিদে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে উত্তর যেভাবে তাবৎ প্রাকৃতিক সম্পদের সিংহভাগ ভোগদখল করেছে, দুশো বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রকৃতি-ধ্বংসী কারিগরীর চর্চা ও প্রয়োগ করেছে, আজকের অবস্থা তারই ফল। আমরা দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ দুভাবে এর শিকার—প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টনে তারা হয়েছে বঞ্চিত, দ্বিতীয়ত দূষণেরও শিকার হয়ে পড়েছে তারাই। উত্তর ও দক্ষিণের দায়ভাগ যেহেতু সমান নয়, আমাদের সঙ্গতিও নেই, তাই উত্তরকেই নিতে হবে উদ্যোগ, এগিয়ে আসতে হবে টাকা ও টেকনোলজি নিয়ে—নিঃশর্তে।

আমাদের দারিদ্র দূর করার, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নানা পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে, তারই সঙ্গে আমাদের খেয়াল রাখতে হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষার দিকটাও। এই কঠিন কাজে উত্তর যদি এগিয়ে না আসে, যদি দূষণমুক্ত বিকল্প টেকনোলজি হস্তান্তরে সর্ত ও প্রতিবন্ধকতা আনতে চায় তাহলে দূষণের জন্য আমাদেরকে দায়ী করা হবে অন্যায় এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি, দুরভিসন্ধিমূলক। সেক্ষেত্রে আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে যে স্থানীয় জীব-প্রজাতিগুলিকে কোনরকম গবেষণার জন্যই আমরা শিল্পোন্নত দেশের হাতে তুলে দিতে পারি কিনা। তবে সমগ্র মানবজাতির শুভবুদ্ধির উপর আস্থা আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, আমি আশাবাদী।

বক্তা পাঁচ: তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি (বেসরকারী)

সাধারণভাবে এখানে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে উৎসাহিত হচ্ছি আমরা। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবার আগেই আমাদের কাজে নামতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি শুধু বিশেষ দু-একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কেউ কেউ এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে ধান উৎপাদনের দ্বারা আমরা গ্রীণহাউস গ্যাস মিথেন বাতাসে ছাড়ছি, ঘটনা হিসেবে এটা ঠিকই। কিন্তু মিথেন এখনও তুলনামূলকভাবে অল্পই প্রভাব ফেলছে। দরিদ্র মানুষের প্রধান খাদ্য উৎপাদনের জন্য সামান্য দূষণ এবং ধনীর ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য অত্যধিক জ্বালানী ব্যবহারজনিত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রবল দূষণ ক একই শ্রেণীতে পড়ে? আমাদের খাদ্যাভ্যাস বা শস্য উৎপাদন ছাঁচ পাল্টাবার চেষ্টা কিন্তু মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। আফ্রিকার কোন কোন দেশে মূল খাদ্য ফসলের পরিবর্তে কফির মত রপ্তানীযোগ্য ফসল ব্যাপক হারে চাষের কি ফল হয়েছে তা তো কারও অজানা নয়।

কারও কারও চোখে বনাঞ্চল শুধুমাত্র কার্বনডাই-অক্সাইড শোষক। সেজন্যই বন রক্ষায় তাঁদের মাথাব্যথা। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে একটি জানা কথা আবার জানাতে চাই যে আমাদের কাছে বন তার চেয়েও অনেক বেশী—আমাদের দরিদ্রতমদের জীবিকার উৎস, জীবনের আধার বন। বস্তুত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ আমাদের পরম্পরাগত ঐতিহ্য, আমাদের শিল্পসংস্কৃতির অঙ্গ। এখনকার পরিবেশদূষণের পরিভাষা না জেনেও, আমাদের দেশে তাই গড়ে উঠেছে শত-শত সংগঠন। পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে কোন না কোন ভাবে তারা কাজ করে চলেছে। আমরা আমাদের সরকারকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনকানুন কঠোর করতে বলছি, বলছি এগুলো নির্ভীকভাবে প্রয়োগ করতে। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমাদের বলতে হবেই। আমরা সামাজিক-ভাবে দায়বদ্ধ—যে অভুক্ত মানুষের কাছে পরিবেশ একটা বিমূর্ত ধারণামাত্র। তার জন্য মানুষকে আরও কষ্ট স্বীকার করতে বলা প্রতারণার সামিল। কোটি কোটি ভুখা নাঙ্গা দেশবাসীর করুণ মুখ আমাদের তাড়া করছে সর্বদা। তাই কোন কিছুর বিনিময়েই আমরা উন্নয়নের গতিকে স্লথ হতে দিতে পারি না। বস্তুত এ গতি এখন যথেষ্ট নয়, তাকে বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে—কৃষির, শিল্পের; জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে হবে—তার জন্যও জীবনের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, শিশু মৃত্যুর হারও কমাতে হবে। আর এসবের জন্য অর্থও কারিগরী আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আপত্তি উঠলে, এসব প্রয়াস অর্থহীন হয়ে পড়ে। পরিবেশ দূষণের জন্য আমাদের দায়ী করা অসঙ্গত ও অন্যায়। পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের সচেতনতা কারও চেয়েই কম নয়, আর তাই আমরা এখনও ব্যাপকভাবে বিধ্বংসী টেকনোলজির ব্যবহারের দিকে ঝুঁকিনি।...যাহোক, আমাদের মন্ত্রীমহোদয় যথার্থই বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমেই পরিবেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমরা মনে করি। সংঘাত নয়, সহযোগিতাই এখন থেকে ইতিহাসের চালিকা।

পরিবেশ: জাতীয় মঞ্চ

প্রথম বক্তা: কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি

বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে আমরা খুবই সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। বহু দেশ পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন; অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য সাধারণভাবে সমর্থিত হয়েছে। মোটের উপর বলা যায়, বিশ্বপরিবেশ সম্মেলন সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে অনেকটাই। অবশ্য সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই, আরও বহু পথ যেতে হবে আমাদের। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা একটা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপার, যেহেতু মানুষের উন্নতি কখনই থেমে যাবার নয়।

আমাদের এবং আমাদের মত অনেক দেশের দুর্দশার একটা অন্যতম কারণ হল যে আমরা শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাইনি। যেসব দেশ শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে উন্নত হয়েছে, তারা আজ দূষণের ধুয়ো তুলে আমাদেরকে ওপথে হাঁটতে বারণ করতে চায়, কিন্তু আমরা সাফল্যের সঙ্গে তাদের এই বক্তব্যের ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছি। কোটি কোটি ভারতবাসীর জন্য জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতেই হবে চাই আরও খাদ্যশস্য, উন্নত বীজ, প্রচুর সার কৃষিযন্ত্রপাতি; চাই ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবস্থা, চাই বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং আরও অনেক কিছু।

কিন্তু পরিবেশ দূষণের তোয়াক্কা না করে আমরা এসব পেতে চাই, তা মোটেই নয়। বস্তুত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদগুলি

এ ব্যাপারে জাগ্রত প্রহরীর কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে পরিবেশমন্ত্রক তৈরী হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের সুপরামর্শ নেবারও নানাবিধ ব্যবস্থা করা গেছে। অনেকগুলি সুরক্ষামূলক আইন তৈরী হয়েছে, যেগুলি ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বহু দেশের আইনের চেয়েও কঠোর। শিল্প স্থাপন, পুনর্গঠন বা সম্প্রসারণে পরিবেশের প্রশ্নটি খুঁটিয়ে বিচার করে তবেই অনুমোদন দেওয়া হয়।

তবুও, একথা ঠিকই যে প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণের পথে অল্পসংখ্যক কিছু মানুষের কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েই থাকে। আগে তাঁদের প্রতি সুবিচার অনেক ক্ষেত্রে হয়নি। কিন্তু এখন আমরা সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক। প্রতিটি বাস্তুচ্যুত বা অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন বা জীবিকাসংস্থানের বন্দোবস্ত করেই আমরা প্রকল্প রূপায়ণে হাত দিই বা অনুমতি দিই।

এত সব সত্ত্বেও, কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ পরিবেশ আন্দোলনের নামে প্রকল্প তথা শিল্পের বিরোধিতা করেই চলেছে। সুস্থ চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি ভারতবাসীকে আমরা অনুরোধ করব এসব মানুষ থেকে দূরে থাকতে, এদের কথায় কর্ণপাত না করতে। বস্তুত, এদের কার্যকলাপে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এসব তথাকথিত আন্দোলনে ভিনদেশী উস্কানি ও প্রত্যক্ষ মদত কাজ করছে। কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণও আমাদের হাতে আছে। তবুও আমরা নরম মনোভাব নিয়েই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য জানিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি। একথাও ঠিক যে অধিকাংশ মানুষই সরলভাবে, না বুঝে এদের কথার ফাঁদে পা দেন।

ভারতের মত বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এক দেশের পরিবেশ এক জটিল সংস্থান। প্রত্যেকেই যদি নিজ অঞ্চলকে আঁকড়ে ধরে পরিবেশ সুরক্ষার নাম করে শিল্পবিরোধী প্রকল্পবিরোধী নানা আন্দোলনে নেমে পড়ি তবে না হবে পরিবেশরক্ষা না হবে দারিদ্র মোচন। দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই আমাদের প্রধান দূষণ, এটা দেশবাসীকে অনুধাবন করতে হবে। অনেক মানুষের উন্নতি ও দেশের অগ্রগতির জন্য সামান্য কিছু ত্যাগস্বীকার— এটাই তো আমাদের চিরায়ত শিক্ষা। প্রয়োজনের মুহূর্তে আমরা কি সে শিক্ষা ভুলে যাব?

বক্তা দুই: রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি

গোটা পৃথিবী আজ বুঝেছে যে পরিবেশ ধ্বংস করে যে উন্নতি তা স্থায়ী হয় না। বরাবর আমরা সে কথাই বলে আসছি। রাজ্যের উন্নতির জন্য আমরা যে প্রকল্পই গ্রহণ করি না কেন, পরিবেশের প্রশ্নটিও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েই বিচার করি।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব আর হা-হুতাশ করব। উন্নয়ন-সহায়ক বিভিন্ন প্রকল্প আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে। গরীব মানুষদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার লক্ষ্যে আমাদের কাজ চলছে, চলবে। এতদিন ধরে কেন্দ্র আমাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, তাই অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় আমরা শিল্পে পিছিয়ে পড়েছি। তীব্র গণআন্দোলনের চাপে এখন আমরা অবস্থাটা কিছুটা অনুকূলে আনতে পেরেছি। বহুপ্রতীক্ষিত কয়েকটি প্রকল্প ও শিল্পের অনুমোদন পাওয়া গেছে। সেগুলির কাজ জরুরী ভিত্তিতে হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি আমাদের কম, কেন্দ্রে কুক্ষিগত। একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত, অন্যদিকে এসব প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

কিন্তু নতুন করে অসুবিধা কিছু দেখা দিয়েছে। লাইসেন্স প্রথা ইদানীং তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু দূষণের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় খবরদারীর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু প্রকল্প আটকেও রাখা হয়েছে পরিবেশের উপর তাদের সম্ভাব্য প্রভাব খতিয়ে দেখার অজুহাতে। সেচ-সার বিদ্যুৎ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও এর মধ্যে আছে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারেও আমাদের অঞ্চলের তথা রাজ্যের দাবীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য স্থান নির্বাচন হয়ে গেছে। বিস্তারিত রিপোর্ট ও নক্সা সহ পরিকল্পনাও শীগগীর পেশ করা হবে। অতীতের মত তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলে রাজ্য গুলির মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির এই নতুন প্রচেষ্টাও আমরা রুখব। আমরা দাবী জানাব যে উন্নয়নের প্রশ্নে রাজ্যগুলির ভাবনা রাজ্যকেই ভাবতে দিতে হবে। আমাদের রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যথেষ্ট শক্তিশালী ও দক্ষ। অনেক কটি জেলাতেও আমরা শাখা অফিস খুলেছি। যন্ত্রপাতি গবেষণার পরিকাঠামোও তৈরী করা হয়েছে। তারাই দূষণ-রোধের ব্যাপারটা দেখতে পারে। এছাড়াও রয়েছে আমাদের ছাত্র-যুব-মহিলা বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের বিভিন্ন সংগঠন ও নানান মঞ্চ। তাদের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাপক কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি এবং পরিবেশ সংরক্ষার ব্যাপারে তারাও সতর্ক প্রহরীর মত কাজ করছে। প্রয়োজনে তারা সরকারী কাজকর্মের সমালোচনাও করে থাকে। ...ইতিমধ্যেই চালু কারখানাগুলির একটা বড় অংশকেও আমরা দূষণ-সমীক্ষার আওতায় এনেছি। দূষণ প্রবণ কলকারখানা-গুলিকে সম্ভাব্য মাত্রানুসারে চিহ্নিত ও ভাগ করা হয়েছে। কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি তারা অবিলম্বে গ্রহণ ও কার্যকর করে। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর।

একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে। সামান্য যে কয়েকটি শিল্প ও অন্যান্য প্রকল্প রূপায়িত হতে যাচ্ছে তাতে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী বাধার সৃষ্টি করছে দূষণের অছিলায়। অবাস্তব অবান্তর নানা প্রশ্ন তুলে এরা ছড়াচ্ছে গুজব ও বিভ্রান্তি। বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অল্প কিছু মানুষের অসুবিধার কথা তুলে যেমন এসব বাধা আসছে, তেমনি

বাধা আসছে সার কারখানা স্থাপনে, সেচ ও নদীবাঁধ প্রকল্পে, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়াসে ; শহরের লাগোয়া জলাভূমি নিয়ে সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নেওয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু আশার কথা এই যে এ রাজ্যের সচেতন জনগণ আমাদের উপরই আস্থা ন্যস্ত করেছেন এবং এসব উন্নয়ন বিরোধীদের কথায় তেমন কান দিচ্ছেন না।

প্রকল্প রূপায়ণে যাদেরই বিন্দুমাত্র আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষতির সম্ভাবনা, তাঁদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আমরা অবশ্যই করব। কিন্তু রাজ্যের, দেশের অগ্রগতির প্রশ্নে, দারিদ্র দূর করার প্রশ্নে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উস্কানিদাতাদের চাপের কাছে আমরা নতিস্বীকার করব না, আপোষ করব না।

বক্তা তিন : স্থানীয় শিল্প প্রতিনিধি

অনেকের ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ চেতনা বাড়ছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, যা বাড়ছে তা চেতনা নয়, বিভ্রান্তি! আমরা অগ্রাধিকার বোধ হারিয়ে ফেলছি। আগে কোনটা করা দরকার উৎপাদন না পরিবেশ সংরক্ষণ—সেই বোধটাই ফেলছি গুলিয়ে। এই দেখুন না, এ রাজ্যে কৃষির অগ্রগতি অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় কম। এই জেলা আবার রাজ্যের মধ্যে পিছিয়ে পড়া, দারিদ্রতর। কারণ কৃষিতে সার ব্যবহার এখানে অত্যন্ত কম। তাই রাজ্য সরকারের আগ্রহে একজন শিল্পোদ্যোগী এগিয়ে এলেন এখানে একটা অধুনিক সার কারখানা গড়তে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন তুলনামূলকভাবে সস্তায় সার দেবেন স্থানীয় কৃষকদের। প্রত্যক্ষভাবে শ'দেড়েক লোকের কর্মসংস্থান ছাড়াও পরোক্ষভাবে আরও অন্তত একহাজার লোকের কাজ হবে। তাছাড়া, চারপাশে বনসৃজন হবে, পার্ক হবে, হবে একটা স্কুল ও একটা হাসপাতাল। সব মিলিয়ে এ জেলায় হবে এক নতুন বিশাল কর্মকাণ্ড। প্ল্যান্ট হবে একেবারে আধুনিক। আমেরিকা থেকে দূষণ রোধক যন্ত্রপাতি আসবে, এক বিন্দু দূষণও ঘটবে না।

কিন্তু কিছু কুপমণ্ডুক অপপ্রচার চালাচ্ছে। এতে নাকি স্থানীয় পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়বে। রোগ হবে, জল মাটির ক্ষতি হবে। এসব একদম অজ্ঞ লোকদের কথা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ পরিবেশের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে ছাড়পত্র দিয়েছেন। গোটা দেশে অন্তত একশোটা এরকম কারখানা চলছে। আমরা কোন্‌টা চাই—উন্নতি না অজ্ঞতা ও অন্ধকার—তা আমাদের ঠিক করে নিতে হবে।

আমি পুঁজিপতি নই, জোতদার নই, মন্ত্রী বা আমলা কিছুই নই। একজন সাধারণ দেশবাসী হিসেবে আমি দেশকে ভালবাসি বলেই, এসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

সত্যি কথা বলতে কি দূষণ দূষণ বলে চ্যাঁচানো কিছু কিছু লোকের একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে। দু চারটে বই পড়ে, বিদেশী খবর শুনে কিছু ভাল করে না জেনে তারা ভয় ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। স্বঘোষিত পরিবেশ বিশেষজ্ঞও বনে যাচ্ছেন অনেকে, রাতারাতি। বুদ্ধিজীবিদের একাংশও এতে সামিল। বিভিন্ন বড় শহরের এইসব তথাকথিত পরিবেশবিদরা যেন একটা প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। একজন যদি দাবী করেন কলকাতা ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহর, পরদিন অন্য একজন দাবী করেন দিল্লীর বাতাসে ধূলোবালি কলকাতার থেকেও বেশী পাওয়া গেছে। অথচ, এঁরা যেসব তথ্য দিচ্ছেন তা একধরণের কারচুপি। শহরের ব্যস্ততম অঞ্চলে কোন এক কাজের দিন কর্মমুখর এক সময়ের বায়ুদূষণের মাপ নিশ্চয়ই সেই শহরের বায়ুদূষণের সূচক হতে পারে না। তার জন্য দীর্ঘসময় ধরে বিরামহীন পরিমাপ দেওয়া দরকার। দেশে এধরণের বায়ুদূষণ মাপার ব্যবস্থাই নেই! অথচ এইসব বিশেষজ্ঞরা চীৎকার করে যাচ্ছেন, ভয়ংকর বায়ুদূষণ ঘটছে, বাতাসে ধূলিকণা ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ মাত্রাছাড়া ; আর সেজন্যই শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত অসুখ বিসুখ বেড়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি। তথচ কোন তথ্যই প্রমাণিত নয়। নানাভাবে বাতাসে সর্বদাই ভাসমান কঠিন পদার্থ থাকে, শিল্পের জন্য তা কতটা বাড়ছে জানা নেই। এই তো, পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) যৌগ নাকি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী, অথচ এঁরা খবরও রাখেন না যে সম্প্রতি ইংলণ্ডে গবেষণা করে এটা প্রমাণিত হয়নি। ওজোন স্তরে ফুটো হওয়া বা পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞরা একমত হতে পারেন নি। এসব যে স্বাভাবিক সাময়িক পরিবর্তন নয়। এমন কথা জোর দিয়ে বলার মত তথ্যই আমাদের হাতে নেই। অথচ সেসব প্রসঙ্গও তোলা হয় একটি ছোট কারখানার গড়ে ওঠার বিরোধিতা করে।

আমাদের মত গরীব দেশে যে এ বিলাসিতা সাজেনা এটুকু বাস্তববোধ আমাদের কি হবে না? এইসব তথাকথিত আন্দোলনকারীরা নিজেরা অনেকেই মোটা মাইনের চাকরী করেন, গাড়ী চড়েন, বাড়ী আছে। আবার পরিবেশ আন্দোলন টান্দোলন করে কেউ কেউ নেতাও বনে যাচ্ছেন, বিদেশী পুরস্কার টুরস্কারও পাচ্ছেন। প্রকারান্তরে এঁরা কিন্তু গরীব মানুষদেরই আরও ক্ষতি করছেন। লজ্জাও করে না!

আমাদের সরকারের আচরণও অদ্ভুত। মন্ত্রী আমলারা বিদেশ ঘুরে টুরে এসে একটা করে আইন বানিয়ে ফেলছেন। মর্জিমাফিক এক এক ক্ষেত্রে সেগুলোকে বাধা হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন। আমার তো মনে হয় ভারতে আপাতত বায়ুদূষণ আইনটা মুলতুবী রাখা উচিত।

শিল্পোদ্যোগীদের মুনাফাই দেখে লোকে, তাদের পরিশ্রম অধ্যবসায় অর্থব্যয় সাধারণত নজর এড়িয়ে যায়। আর দেশসেবা? সেকথা না হয় না-ই বললাম। শুধু কথায় তো চিঁড়েও ভেজেনা, মানুষের

পেটভরা দূরের কথা। তার জন্য চাই উৎপাদন, হ্যাঁ, উৎপাদন প্রথম, তারপরও উৎপাদন এবং শেষে আরও উৎপাদন। উন্নতির এটাই একমাত্র পথ।

বক্তা চার: পরিবেশ আন্দোলনকারী (এক)

দূষণের ভূত আজ আমাদের তাড়া করেছে। দূষণ সর্বত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের সাথে যুক্ত হয়েছে সামাজিক, মানবিকও মূল্যবোধের দূষণ। যে দেশে হাসপাতালে রোগীর খাবার চুরি হয়, ডাক্তররা রোগীর জীবনের চেয়ে ব্যবসাকে প্রাধান্য দেয়, জীবনদায়ী ওষুধে ভেজাল শিশুখাদ্যে ভেজাল, শিক্ষকরা শিক্ষকতা ছেড়ে টুইশানি করেন, সেদেশে পরিবেশ দূষণ রোধে উদ্যাগ নেবার সাথে সাথে এসব দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে, নাহ'লে কোন ফলই পাওয়া যাবে না।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা আজ আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে উন্নয়নের বিনিময়ে পরিবেশ সংরক্ষণ চাইলে ভুল করা হবে। শিল্পোন্নত দেশগুলো আমাদের মত গরীব দেশের ঘাড়ে দূষণের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করছে। এমনকি সুকৌশলে তারা আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধানের উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তা নাহ'লে নাকি অচিরেই মিথেন গ্যাস প্রধান বায়ুদূষক হয়ে উঠবে! প্রাকৃতিক সম্পদের শতকরা 60/70 ভাগ ভোগ করবে উন্নত অল্প কটি দেশের অল্পসংখ্যক মানুষ আর আমরা তাদের ছাড়া সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দূষণের শিকার হয়ে চলব—এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না। প্রথম বিশ্বের জন্য অক্সিজেনের যোগান এতদিন ধরে আমরাই দিয়ে আসছি, এবার কড়ায় গণ্ডায় দাম উশুলের পালা।

প্রথম বিশ্ব আমাদের এখন বৈরাগ্যের বাণী শোনাতে চায়। কিন্তু ও বিষয়ে আমাদের নতুন করে শিক্ষার কিছু নেই, অন্তত ওদের কাছ থেকে।

আমাদের উন্নতি করতেই হবে। তার জন্য শিল্প কৃষিতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহারও করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন আমাদের লড়াই করতে হবে পরিবেশের নাম করে আমাদের উন্নয়নের পদ্ধতি ও গতির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিরুদ্ধে, তেমনি জাতীয়স্তরে আমাদের লড়াই হবে পরিবেশ বাঁচিয়ে কলকারখানা স্থাপন, সেচ-বিদ্যুৎ-ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণ। অন্ধভাবে শিল্পের বিরুদ্ধে, প্রকল্পের বিরুদ্ধে কথা বলা খুবই অনুচিত। শিল্প ও পরিবেশ এত জটিল ও টেকনিক্যাল ব্যাপার যে তার জন্য, আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভর করাই যুক্তিযুক্ত। সাধারণ মানুষের বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নেওয়া কি ভালো?

হ্যাঁ, বিকল্প প্রযুক্তি, উন্নয়নের বিকল্প পদ্ধতি ইত্যাদি কথা মাঝে মধ্যে শোনা যায়। কিন্তু বনের দুটো পাখির চেয়ে হাতের একটা পাখিই ধরে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? পরিক্ষীত, প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত পথ ছেড়ে অপ্রতিষ্ঠিত অনিশ্চিত, তথাকথিত বিকল্প পথ হাঁটার ঝুঁকি আমরা কি নিতে পারি?

তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষেরও পরিবেশ সংরক্ষণে অনেক কিছুই করার আছে। গাছ লাগানো এবং সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখায় আমরা সচেষ্ট হতে পারি। স্কুল থেকেই শিশুদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির আন্দোলন ও কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করতে পারি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিতে পারি। যত্রতত্র থুতু-মল-মূত্র ছড়ানো, কলার খোসা ফেলা থেকে নিরস্ত হতে পারি। বাজি-পটকা-মাইক সহযোগে জনজীবন অতিষ্ট করে তোলার বিরুদ্ধে নানাভাবে কাজ করতে পারি। বস্তুত, সচেতন জনগনই পরিবেশের প্রকৃত রক্ষক। নিজের কাজটুকু যদি আমরা ভালভাবে করার দিকে নজর দিই, তাতেই অনেকখানি। আমরা সকলে মিলে, আসুন, অঙ্গীকার করি যে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য 'এ পৃথিবী বাসযোগ্য করে যাব, এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

বক্তা পাঁচ: পরিবেশ আন্দোলনকারী (দুই)

আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনকে যাঁরা তামাশা মনে করেন, আমি তাঁদের দলে নই! বিভিন্ন দেশের সরকার ও তাদের সহায়কদের কাছে এর জরুরী প্রয়োজন ছিল, আবার দুনিয়ার তাবৎ উৎপাদনকারী দরিদ্র আমজনার পক্ষও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা।

আমেরিকা সহ সাত দেশের গোষ্ঠীর কাছে, প্রথম বিশ্বের কাছে এটা বাজার দখলের কৌশলের অঙ্গ। কেননা আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শিল্প, সবচেয়ে মুনাফার বাণিজ্য হ'ল দূষণ নিয়ন্ত্রণ শিল্প ও বাণিজ্য। দূষণ নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় টেকনোলজি ও যন্ত্রপাতি তাদের কাছ থেকেই আমাদের যাতে নিতে হয়—প্রথমে হয়তো অনেকটাই সাহায্য ও ঋণ হিসেবে, পরে নগদ ডলারে—যাতে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন নিজেদের পছন্দমত পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়—এধরণের সম্মেলনের ভূমিকা সেখানে বিরাট।

তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিরা ঐ সম্মেলনে দুধরনের কথা বললেন—এক পরিবেশ দূষণের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোই মূলত দায়ী; দুই, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে এবং দূষণরোধে প্রথম বিশ্বকেই দিতে হবে টাকা ও টেকনোলজি—ঠিক যা চায় প্রথম বিশ্ব, বিশেষত সাত দেশের গোষ্ঠী! চমৎকার!

বিশ্বের মধ্যে যেমন বিশ্ব, তেমনি ভারতের মধ্যেও আছে একাধিক ভারত—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। তৃতীয় ভারতের মানুষ আর প্রথম ভারতের মানুষ—কি একই কথা বলতে পারে? তাদের কি আভন্ন চাহিদা—একই পথে সবার উন্নয়ন? একটা তথ্যের দিকে নজর করুন—ওঁদেরই দেওয়া তথ্য। 1937 সালে আমেরিকার প্রতিটি মানুষ

গড়ে নাকি 5 টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছাড়ার জন্য দায়ী। অর্থাৎ 30 কোটি লোকসংখ্যা ধরলে মোট 150 টন। আর ভারতবাসী প্রতিজন মাত্র 0·4 টন কার্বন ডাইঅক্সাইড দূষণের জন্য দায়ী। আমরা 90 কোটি তাহলে 36 টন কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ার জন্য দায়ী। যে প্রশ্ন আমাদের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে তুলেছিলেন, ভারতে সে প্রশ্ন তোলা কেন হবে অপরাধ? কেন প্রশ্ন করা হবে না যে এই 36 টন কার্বন ডাইঅক্সাইডের দায়ভাগ প্রথম ভারতের কতটা, কতটা তৃতীয় ভারতের? সরকারী তথ্য অনুযায়ীই বলা যায় আমাদের উন্নয়নের 'ফসল' তো মাত্র শতকরা 10 জনের ঘরে পৌঁছায়। তবে দরে 10 কোটি ভারতবাসী তাহলে এই দূষণের জন্য দায়ী, গড় মাথাপিছু 3·6 টন, যা উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলোর মাথাপিছু অবদানের—2·5 টনের চেয়েও অনেক বেশী! তাহলে পরিবেশ দূষণের জন্য প্রথম বিশ্বের দিকে আঙুল তোলার সঙ্গে সঙ্গে, তৃতীয় ভারতের দরিদ্র জনতা যদি প্রথম ভারতের দিকেও আঙুল তোলে তবে দোষ দেওয়া যায় কি?

আর উন্নয়ন? কিসের উন্নয়ন? তেল ও গ্যাস পুড়িয়ে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড উড়িয়ে যে বিদ্যুৎ বা সিমেন্ট তৈরী হয়, তা কতটুকু খায় তৃতীয় ভারত? পাঞ্জাবে 'সবুজ বিপ্লব' হলেও দরিদ্র পাঞ্জাববাসীর সংখ্যা বেড়ে যায় কেন? ভাকরা, দামোদর, টেহরী বা নর্মদায় বাঁধ হলে কার লাভ কতটা? ক্ষতিই বা কার? জলে ডোবে কারা? কারা হয় গৃহহীন, জীবিকাহীন, শিকড়হীন? হাজার হাজার গাছ-গাছড়া ও জীবপ্রজাতি ধ্বংস করে কার উন্নয়ন সাধিত হয়? ভূপালে কারা মরে, পঙ্গু হয়?

বনাঞ্চল রক্ষায় এঁরা কতই না উৎকণ্ঠিত? বড় মুখ করে বলেন বন শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইডের শোষক নয়—উন্নত দেশগুলি যেভাবে দেখতে চায়—বন আমাদের দরিদ্র মানুষের জীবিকার উৎস; জীবনের, সমাজের ভিত্তি। অথচ দেখুন সেই দরিদ্র মানুষকেই আইন করে দূরে সরিয়ে দিয়ে, শহুরে কাঠের ব্যবসায়ী আর দালালদের জন্য সংরক্ষণ করে, বনের চরিত্র পাল্টে দিয়ে বন ধ্বংসে মেতে আছে প্রথম ভারত। আর বিশ্বসভায় সাধারণ দরিদ্র মানুষের নাম করে কী কাঁদুনিই তাঁরা কাঁদলেন। এঁদের অভিনয়কে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না!

আমাদের সরকার ঐ প্রথম ভারতের রক্ষক ও প্রবক্তা। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পে বলি হয় তৃতীয় ভারতের মানুষ। এই তো দেখুন না, মহানগরীর পাশের জলাভূমি; তাকে দেখা হচ্ছে নগরীর পয়ঃপ্রনালীর extention হিসেবে। এজন্য যেটুকু জলাভূমি দরকার তা বাদে বাকী অংশে হবে শহরের সম্প্রসারণ! ওঁদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাদ পড়ে যায় সেই হাজার হাজার মানুষ যারা প্রায় দেড়শো বছর ধরে নোংরা জলকে শোধন করার সহজ কৌশল রপ্ত করেছে—আবর্জনা থেকে তৈরী করছে সম্পদ।

বন থেকে বনের কাছের মানুষদের হঠিয়ে, জলাভূমি থেকে দক্ষ উৎপাদকদের উৎখাত করে আমরা আমদানী করব প্রথম বিশ্বের উন্নয়ন পন্থা। তৈরী হবে আধুনিক শহর, কারখানা, ড্যাম—এবং অবশ্যই তার সঙ্গে দূষণ-নিবারক যন্ত্রপাতি বসবে; টাকা ধার দেবে বিশ্বব্যাঙ্ক বা কোন উন্নত দেশ! আর তৃতীয় ভারতকে বিশ্বাস করতে হবে—জীবন দিয়েও—যে তাদেরই উন্নতির জন্য এসব হচ্ছে! কিন্তু ভারতের গরীব মানুষেরা ধার করা টাকায় বিলাসিতা করতে লজ্জাই পায়! লজ্জা পায়না প্রথম ভারত, কেননা এতে তাদেরই পকেট উপচে পড়ে—ধার করা ডলারে। ...আর দূষণহীন উন্নয়নের নমুনা দেখুন—সরকারী কলকারখানা প্রকল্পগুলোই ভারতে প্রধান দূষক। আইন? হ্যাঁ, কিছু আছে ঠিক কথা সে শুধু লঙ্ঘণ করবার জন্যই। সরকার নিজেই নিজের আইন ভেঙ্গে দূষণ ঘটাচ্ছেন—এ তত্র সর্বত্র। তাঁবেদার শিল্পগোষ্ঠীর জন্য আইনের বাঁধন শিথিল হতে দেরী হয় না।

এসব প্রশ্ন তুলতে গেলে আখ্যা জোটে—উন্নয়ন বিরোধী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, এমন কি বিদেশী চর! বিদেশের সাথে যোগাযোগ আমার বেশী না বেশী সরকারের, শিল্পগোষ্ঠীর? বিদেশী টাকা ছাড়া তো কোন প্রকল্পই রূপায়ণ করা যাচ্ছে না। প্রবাদ ঠিকই বলে—চোরের মার বড় গলা!

বলা হয়, প্রথম বিশ্ব আমাদের উন্নতি চায় না বলেই ওদের পথে হাঁটতে বারণ করে; বলে, দূষণ হবে! এ নাকি একটা চক্রান্ত! হ্যাঁ, আমিও তাই-ই মনে করি, কিন্তু একটু উল্টোভাবে। উন্নত দেশের ভুল পথগুলোকে অবশ্যই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। নিজেদের ভেতর থেকে এবং পৃথিবীর সব কোণ থেকে বেছে নিতে হবে সঠিক রাস্তা, প্রকৃত বন্ধু। উন্নত দেশেও পরিবেশের প্রশ্নে অনেক আন্দোলনকারীর জোটে লাঞ্ছনা, নির্যাতন, মৃত্যু। একটা গোটা দেশ—তার সব মানুষ—উন্নত বলেই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ যুক্তি মানতে হলে আমাদের তাবৎ তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্প এক্ষুনি বন্ধ করে দিতে হয়।

আমরা একটা দুষ্টচক্রে পড়ে গেছি। প্রথম ভারতের লোভ আর স্বার্থপরতা আমাদের ঠেলে দিয়েছে, দিচ্ছে এমন একটা পথে, যার ফলে ক্রমাগত আমরা পরিবেশ দূষিত করে চলেছি। বৈষম্য বাড়িয়ে চলছি। সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করছি। ক্রমশ আমাদের সমস্ত কর্মের ক্ষেত্র, উপাদানের উৎস এই ভূখণ্ডকেই করে তুলছি নিস্ব, রিক্ত।

বঞ্চিত তৃতীয় ভারতের লড়াই আজ পরিবেশের ময়দানে। আর ভারতবাসীর উন্নতি আর বেঁচে থাকা নির্ভর করছে তারা নিজেরা নিজেদের ভালমন্দ বেছে নিতে পারবে কিনা তার উপর। ধার করা বিজ্ঞান-কারিগরী, ঋণ করা অর্থ, বাইরে থেকে, উপর থেকে চাপানো উন্নয়ন প্রক্রিয়া—তাদের জীবচর্যা, অভ্যাস-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই বিপন্ন করে তুলেছে। আর সব বিপন্ন জীবপ্রজাতির সঙ্গে এক সারিতে বসে আছে মানুষও। হ্যাঁ, সব মানুষ। দূষণকে বেশিদিন এভাবে তৃতীয় ভারতের জনগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না।

বিকল্প পথ নাকি কিছু নেই; অপ্রমাণিত, অপ্রতিষ্ঠিত। শিল্পে তেমন না হলেও কৃষি, পশুপালন বনসংরক্ষণে সাধারণ মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা জ্ঞান ও দক্ষতার ধার ধারেনা যারা তারাই একথা বলার স্পর্ধা দেখায়। বিকল্প উদ্ভাবন বাছাই ও গ্রহণের কষ্ট তারা কেন করবেন যাদের আশু লাভ ধার করা ডলারে? তাদের সে সাহস আর সংকল্পও নেই। কেননা জীবন তাদের ম্যানেজ করা অস্তিত্ব মাত্র, আত্মিক সংগ্রাম নয়। কাজেই আমাদের বিকল্প বিকাশ, পরিবেশ-সহায়ক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করতেই হবে—যাতে মানুষেরই জন্য মানুষেরই সহযোগিতায় স্বনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে আমরা এগোতে পারি। □

—রবীন মজুমদার

রিওতে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন পরিবেশমন্ত্রী স্বয়ং। দক্ষিণ গোলার্ধের দারিদ্রদের জন্য প্রচুর লড়লেন। তিনি ভাল ভাল কথা বলে সবাইকে তাক লাগালেন। আমাদের দেশের বনভূমি এলাকার মানুষদের পক্ষে যা বলেছেন তা এক কথায় বৈপ্লবিক। ওখানে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—'আমি বুঝতে পারছিনা এখানে এসে সবাই বনভূমি অঞ্চল জাতীয় সম্পদ, না আন্তর্জাতিক সম্পদ এই নিয়ে তর্ক করছেন কেন। আমাদের দেশেতে তো বনভূমি মূলতঃ সেখানকার অধিবাসীদের সম্পদ।"

মন্ত্রী মহোদয়ের এমন বৈপ্লবিক উক্তি নিশ্চয়ই প্রচুর হাততালি কুড়িয়েছে বিদেশের মাটিতে। কিন্তু দেশের মাটিতে কি ঘটছে তখন? —ঠিক উল্টোটাই নয় কি? কি ঘটছে জানতে তুলে ধরা হল দুটি দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্ত—এক

নয়া সংরক্ষণ নীতি মানুষকে শুধুই ছিন্নমূল করে

11ই জানুয়ারী সকাল হল মেঘলা আকাশ নিয়েই, বৃষ্টি নামল একটু পরেই। বেলা তখন প্রায় 10টা, বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে পথ ঘাট। তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে শ' আষ্টেক লোকের একটা মিছিল। মিছিল চলেছে উত্তর প্রদেশের রাজাজী পার্কের দিকে। বেশিদূর যেতে হল না। পার্কের কাছাকাছি আসতেই প্রথমে তাঁদের ফিরে যেতে বলা হল। কিন্তু তাতেও কাজ হল না দেখে বনরক্ষী এবং সি আর. পি. গুন্ডাবাহিনী এলোপাথাড়ি লাঠি চালালো মিছিলের উপর ; শিশু, বৃদ্ধ, নারী পুরুষের তোয়াক্কা না করেই। কিন্তু মিছিলের এক কথা, "হয় আমাদের 'ভাবর' (দাড়ি তৈরীর একজাতীয় ঘাস) সংগ্রহ করার অধিকার ফিরিয়ে দাও, নয়তো গুলি কর, গ্রেপ্তার কর।" বেগতিক দেখে বন দপ্তরের অধিকর্তা জনতার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রায় সকলকেই অপমান করে তাড়িয়ে দেয়া হল।

কেন এই মিছিল ঃ

শিবালিক পাহাড়ের নীচে 65 কি.মি. লম্বা এবং 14 কি.মি. চওড়া ঘাডের (GHAD) দুপাশ ঘিরে আছে নদী। পশ্চিমে যমুনা, পূর্বে গঙ্গা। পশ্চিম অংশটা পড়েছে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায়, আর পূর্ব অংশটা হরিদ্বার জেলায়। 216টা গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা ঘাডের বর্তমান জনসংখ্যা 1·7 লাখ। জীবনযাত্রা প্রচন্ড কষ্টের। শুধু যে জমিকে চষাই যায় না তা নয়, যখন তখন বুনো শুয়োর এবং হাতির পাল নেমে এসে একটু আধটু শস্যও যা হয় তা তছনছ করে চলে যায়। ফলে শিবালিকের বনজ সম্পদ 'ভাবরই' প্রায় 10,000 পরিবারকে প্রতিদিনের রুটি-রুজি দেয়। এই ঘাস থেকে এরা "ব্যান" (দড়ি) তৈরী করে, কখনো-সখনো বনবিভাগে ঠিকে মজুরের কাজ করে, আবার কখনও বা শহরে গিয়ে রিক্সা চালায়, ইঁট বয় ইত্যাদি। দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করা হিমালয়ের তেহরী গাড়োয়াল এবং জম্মু-কাশ্মীর থেকে মাইগ্রেট হয়ে আসা এই দলিত সম্প্রদায় দেরাদুনের পাহাড়ে অরণ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকেছে বহুকাল। অনুমোদন পেয়েছে বনের জ্বালানী কাঠকুটো কুড়োবার ; বাড়ী তৈরীর কাঠ, পশুখাদ্য (রাভানা), পড়ন্ত ফল এবং ভাবর সংগ্রহের—একটা নির্দিষ্ট মূল্যে।

কিন্তু 1986 সাল থেকে উঃপ্রদেশ বনদপ্তর এঁদের ভাবর সংগ্রহের অধিকার কেড়ে নিতে চেষ্টা করে এবং '90 থেকে শুরু হয় এঁদের ছিন্নমূল

করার প্রয়াস। কারণ বনের পশুপাখী এবং গাছপালা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এখানে একটা পার্ক তৈরী হবে। "রাজাজী জাতীয় পার্ক"। '48 থেকে '77 র মধ্যে তৈরী করা শিবালিকের তিনটি অভয়ারণ্য রাজাজী, মতিচুর এবং চিল্লাকে মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরী হবে এই পার্ক। 1983-র অগষ্ট মাসেই উত্তরপ্রদেশ সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষন আইনের সেকশান 35-র এক ধারা অনুসারে প্রাথমিকভাবে একটা নোটিফিকেশন জারি করে এই অভয়ারণ্যগুলো অধিগ্রহণ করে।

831 বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে তৈরী হতে যাওয়া রাজাজী জাতীয় পার্কের আশপাশ ঘিরে আছে 56টা গ্রাম পঞ্চায়েত। আর পার্কের ভিতর দিকে আছে 4টি তুঙ্গা গ্রামের 6050 জন গুজর সম্প্রদায়ের মানুষ। বন দপ্তরই এদের বসতি করিয়ছিল, বন তৈরীর জন্য। গাছ লাগিয়ে তাকে বড় করে এঁরা সরকারকে দিয়েছে কোটি কোটি টাকা, বিনিময়ে পেয়েছে একটা প্রাথমিক স্কুল, পানীয় জল, কিছুটা চারণভূমি এবং কিছুটা চাষভূমিও। কিন্তু এখন বনের পশুপাখীদের স্বার্থেই এঁদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। বিকল্প কোন জীবিকা বা পুনর্বাসনের ব্যবস্হা না করেই। হরিদ্বারের দিকের দড়িশিল্পীরা "ঘাড় ক্ষেত মজদুর সংঘর্ষ সমিতি" নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে '91-র জুলাই মাস থেকে তাঁদের দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। হাজার পাঁচেক লোকের সই করা একটা মেমোরান্ডামও বনদপ্তরের অধিকর্তার ঘরে জমা পড়েছে। শুধু মিটিং মিছিলই নয়, সম্প্রতি তুঙ্গা গ্রামের অধিবাসীরা সুপ্রীম কোর্ট থেকে একটা স্টে অর্ডারও আনিয়েছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। সুপ্রীম কোর্টকে কাঁচকলা দেখিয়ে পার্কের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে BHEL এবং IDPL (ইন্ডিয়ান ড্রাগ এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড) জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছে। এবং সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এখানে একটা সেনাছাউনী তৈরীরও অনুমোদন দিয়েছে।

একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক্

1972-র স্টকহোম ঘোষণাপত্রে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকা তৈরীর কথা বলা হয়। এবং 1980 তে ঘোষিত হয় বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি। '83 তে এদেশে তৈরী হয় ন্যাশান্যাল ওয়াইল্ড লাইফ এ্যাকশন প্ল্যান। সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে জাতীয় পরিবেশ নীতির আওতায় এনে একে কেন্দ্রীভূত করাই হল এর আসল উদ্দেশ্য। এই আইন বলে সরকার যখন তখন যে কোন জায়গাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে চিহ্নিত করতে পারে। বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষের জীবিকার কোন বিকল্প ব্যবস্হা না করেই তাঁদের উচ্ছেদ করতে পারে। আইন মতে সংরক্ষিত এলাকায় যেহেতু প্রবেশ নিষেধ ফলে কোনরকম বনজ সম্পদ সংগ্রহ করার অধিকারই আর বনজীবীদের থাকে না। ঘাড়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গ্রামবাসীদের ঠিকাদারদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি 300 টাকা দরে ভাবর ঘাস কিনতে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যে সম্পদটা ছিল একান্ত তাঁদেরই নিজস্ব, আজকে তারই জন্য ঠিকাদারের হাতের পুতুল হওয়া ছাড়া দড়িশিল্পীদের আর কোন উপায় থাকছে না। উপরন্তু মূল গ্রাম থেকে 15-20 কি.মি. দূরত্বে সাহারানপুর অঞ্চল থেকে এঁদের ভাবর সংগ্রহ করার কথা বলা হচ্ছে। এটা একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ শুধু যে যানবাহনের অসুবিধা আছে তাই নয়, নিয়মিতভাবে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস পাওয়াও যায় না। এছাড়া এখনও পর্যন্ত পশুখাদ্য এবং জ্বালানীর কাঠ কুটো তাঁরা কোথা থেকে সংগ্রহ করবে তারও কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। সরকারী খাতায় কলমে ক্ষতিপূরণ, পুর্নবাসন, বিকল্প জীবিকার কথা স্বীকৃত হলেও রাজাজী জাতীয় পার্কের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নোটিফিকেশন জারির 9 বছর পরেও এসবের কোন ব্যবস্হাই করা হয়নি। আসলে এগুলো যে এক একটা বিরাট ভাঁওতা সেটা এদেশের বড় বড় "উন্নয়ন প্রকল্প" গুলো দেখলেই বোঝা যায়।

অন্যান্য পার্ক এবং অভয়ারণ্যের মানুষদের কি হল?

রাজাজী জাতীয় পার্কের জন্য মানুষের এই রুটি রুজি হারিয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার ঘটনা কিন্তু নুতন নয়। এদেশের মোট 52 টা জাতীয় পার্ক এবং 372 টা অভয়ারণ্যের মধ্যে 32 টা পার্ক এবং 138 টা অভয়ারণ্যের উপর সমীক্ষা চালিয়েছিল দিল্লীর ইন্ডিয়ান ইনসিটিউট অফ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন '79 থেকে '84-র মধ্যে। সব প্রশ্নর মোটামুটি ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিল মাত্র 18 টা পার্ক এবং 100 টা অভয়ারণ্যের কর্তাব্যক্তিরা। গড় হিসেবে পার্ক এবং অভয়ারণ্যের সীমানার মধ্যে এবং এর আশেপাশে 10 কি. মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে 4659 জন ও 15351 জন এবং 33,859 জন ও 57,446 জন। 20 টা পার্ক এবং 128 টা অভয়ারণ্য থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে—

অধিকার	পার্কে	অভয়ারণ্যে
পশুচারণের	12 টা (60% লোকের)	107 টা (84% লোকের)
বসবাসের	10 ,, (50% ,,)	54 ,, (42% ,,)
কৃষিকাজের	9 ,, (45% ,,)	55 ,, (43% ,,)
জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের	কারুর নেই	69 ,, (54% ,,)
অন্যান্য বনজ সম্পদ (পাতা, মধু, ইত্যাদি) সংগ্রহের	,, ,,	60 ,, (47% ,,)

এর সঙ্গে যদি আরও যে সমস্ত সংরক্ষিত এলাকা তৈরী হচ্ছিল বা হবে বলে কথা হচ্ছিল তাকে যোগ করি তাহলে কি বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠি

প্রতিনিয়ত এই "সংরক্ষণ প্রকল্পের" আড়ালে আক্রান্ত হচ্ছেন সেটা বোঝা যায়।

যেভাবে বিকল্প উন্নয়ন ঘটানো যেত

এই পর্যন্ত পড়ে যে কোন মানুষের মনে হতেই পারে তবে কি বন্যপ্রাণী এবং বনসম্পদ সংরক্ষণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই? অতি নিন্দুকেও একথা মানবে না। সংরক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সেটা কখনই অগুনতি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নয়। কারণ মানুষও প্রকৃতির একটা অঙ্গ। সংরক্ষিত এলাকার উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে এবং বনের উপর অধিকারকে কেন্দ্র করে বনজীবী মানুষের পুঞ্জিভূত সমস্যা ও ক্ষোভকে প্রণমিত করার জন্য মূল বনের চারপাশ ঘিরে বনজ সম্পদ সৃষ্টিকারী আর একটা অরণ্য অঞ্চল (অরণ্য বলয়) থাকা দরকার। এই অরণ্য বলয়কে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করে মানুষ যেমন তার প্রতিদিনের চাহিদা মেটাতে পারবে তেমনি নিজের স্বার্থেই সে একে রক্ষাও করবে। অন্যদিকে রক্ষা পাবে মূল বনাঞ্চলটাও। একই সঙ্গে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলিও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা দরকার। বনজীবী মানুষের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য পরিবেশ রক্ষাকারী ধারাবাহিক উন্নয়নমুখী প্রকল্পগুলিও (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট) বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন। এদের মাধ্যমে সংরক্ষণ ভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিকল্প জীবিকারও ব্যবস্থা করা যায়। যেমন পতিত জমির উন্নতি, মাটি সংরক্ষণমূলক কাজ, চারণভূমির উন্নতি, খরা অঞ্চল বনসৃজন, অর্থকরী ফসল তৈরী, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, গ্রামীন হস্তশিল্পের বিকাশ ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এসবের জন্য মোট খরচ হবার কথা ছিল 1·24 কোটি টাকা। কিন্তু এসবই হল কথার কথা, কারণ '90 জানুয়ারীতে দেয়া এই ইকো-ডেভেলপমেণ্ট স্কীমটা সরকারী কর্তাব্যক্তিরা আদৌ অনুমোদনই করেন নি। তাঁরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষাকারী আর একটা স্কীম বানিয়ে সেটাই মানুষের উপর চাপানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। "পরিবেশ উন্নয়ন" কথাটা এখন একটা ফ্যাশান। গত কয়েক দশকে "উন্নয়নের" নব নব ধারা যুক্ত হবার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে এক শ্রেণীর মানুষের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসাই আসলে সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। এদেশের পরিবেশ উন্নয়ন কিভাবে ঘটবে তার ফরমুলা তৈরী করে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং শিল্পোন্নত দেশগুলো। জনবিরোধী এই সংরক্ষণ নীতি আসলে বনভূমিকে শোষণ করে কলকারখানায় বানিজ্যিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের চাহিদা মেটানোরই একটা ছল মাত্র। যে কারখানাগুলো প্রতিনিয়ত পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে তাকে ঠেকাতেই আবার বানিজ্যিক বনসৃজন প্রকল্প চালু করা হয়। আর এই ব্যবস্থাটা একটা দুষ্টচক্রের মত সর্বদা চলতেই থাকে। যে কর্তাব্যক্তিরা রিওর বৈঠকে গিয়ে পরিবেশ পরিবেশ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে এলেন তাঁরাই আবার নর্মদা, বালিয়াপাল, কাইগা, সুবর্ণরেখা, তেহরী ইত্যাদি "উন্নয়ন প্রকল্পে" হাজার হাজার হেক্টর বনভূমিকে প্রতিদিন ধ্বংস করে যাচ্ছেন; কলুষিত করছেন প্রকৃতি পরিবেশ। উন্নয়নের এই একপেশে নীতি আসলে কিছু মানুষকে সুখী করলেও অগণন মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয় তার জীবন-জীবিকা সংস্কৃতি সবকিছুই। □

সাহারানপুর বিকল্প সোস্যাল অরগানাইজেশন 92-র মার্চ মাসে এই তথ্যপত্রটি তৈরী করে।

ভাবানুবাদ—কাজল রায়

বই মেলায় আসুন
ছাতার নীচে পাবেন

নাগরিক মঞ্চ

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশিত বই পত্র পত্রিকা

শুরু 27শে জানুয়ারী '93

দৃষ্টান্ত—দুই

সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্প

নর্মদা নদী প্রকল্পের অন্তর্গত সর্দার সরোবর বাঁধ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিয়োজিত পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্ট বিশ্বব্যাঙ্ক নিজেই মানলো না। কি ছিল সেই রিপোর্টে?

সর্দার সরোবর প্রকল্পের রূপায়ণ সম্পর্কে স্বাধীন পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে বিশেষজ্ঞ কমিটিকে নিয়োজিত করেছিলেন, তার চেয়ারম্যান মিঃ ব্ল্যাডফোর্ড মোর্স সম্প্রতি তাঁদের রিপোর্ট বিশ্বব্যাঙ্ক প্রেসিডেণ্ট মিঃ লুই টি প্রেস্টনের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুবৃহৎ রিপোর্টের মূল সিদ্ধান্তগুলি মিঃ মোর্স একটি পৃথক চিঠিতে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টকে জানান। নীচের রচনাটি এই চিঠিরই ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ। শিরোনাম—মূল এবং বিভাগীয়—শুধু আমাদের দেওয়া। রিপোর্টের অন্তিম সিদ্ধান্ত ছিল: "(সর্দার সরোবর) প্রকল্প থেকে সরে এসে নতুন করে সমস্ত দিক বিবেচনা করাই বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষে শ্রেয় হবে।" কিন্তু পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন যে মোর্স রিপোর্টের পরামর্শ বিশ্বব্যাঙ্ক গ্রহণ করেনি; কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক নতুন করে অর্থ সাহায্য দেবার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছে।

পর্যালোচনার পরিধি

ভারতের সর্দার সরোবর বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের পর্যালোচনার জন্য স্বাধীনভাবে ভারপ্রাপ্ত হয়ে 1 সেপ্টেম্বর, 1991 আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। তদবধি আমরা ভারতে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি; ভারত সরকার এবং গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী ও অফিসারদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি; বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠান ও ওয়াকিবহাল নাগরিকদের সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি। শত শত বক্তব্য জমা পড়েছে আমাদের কাছে। নর্মদা উপত্যকার সর্বত্র আমরা গেছি—গ্রামগুলিতে এবং যেসব জায়গায় তাদের সরে যাবার কথা, সেসব জায়গায়; বাঁধের জায়গায়, নদীর উচ্চ ও নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল এবং প্রকল্প অঞ্চল (কমাণ্ড এরিয়া) সবই আমরা ঘুরে দেখেছি। কচ্ছ এবং গুজরাতের অন্যান্য খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলিও আমরা পরিদর্শন করেছি।

আমাদের উপর ন্যস্ত যে কাজ—সর্দার সরোবর প্রকল্পের ফলে উৎখাত বা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি এবং প্রকল্পের পরিবেশগত অভিঘাত থেকে পরিত্রাণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির একটি মূল্যায়ণ—তাতে বিন্দুমাত্র সহায়ক হতে পারে এমন সকলের সঙ্গেই আমরা কথা বলেছি।

সর্দার সরোবর প্রকল্পের ফলে গুজরাতের কচ্ছ ও অন্য খরা-প্রবণ এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ সহ গুজরাতের বিস্তৃত এলাকায় এবং রাজস্থানের দুটি জেলায় সেচের জল যাবার কথা। এর জন্য প্রয়োজন নর্মদা নদীর উপর একটি বৃহৎ জলাধার এবং প্রয়োজন একটি সুবিস্তৃত ক্যানাল ও সেচ ব্যবস্থা। এযাবৎ (বিশ্বে) যেসব বৃহদাকার প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সর্দার সরোবর প্রকল্প তার অন্যতম; এর প্রভাব পড়বে একটি বিরাট এলাকায়, বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষত উপজাতীয়, এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। নিমজ্জন এলাকায় 245 টি গ্রামে বাস করেন অন্তত একলক্ষ মানুষ। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে প্রায় সকলেই উপজাতীয়, যাদের একটি বড় অংশ আবার জবরদখলকারী। অর্থাৎ তাঁদের ব্যবহৃত জমির কোন বৈধ কাগজপত্র নেই। মধ্যপ্রদেশের নিমগ্ন এলাকাতেও হাজার হাজার উপজাতীয় আছেন, তাঁরাও অনেকেই জবরদখলকারী। অবশ্য মধ্যপ্রদেশে বেশ কিছু এমন গ্রামও আছে যেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য বর্ণের চাষী।

> বৃহদাকার প্রকল্প···বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে, যেমন করে যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। উন্নয়নের পথে প্রকল্পজনিত বাস্তুহারাদের মানবাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

···এছাড়াও, ক্যানাল ও সেচব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কৃষিজীবি মানুষ। বাঁধের নীচের দিকে, নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলেও, বেশ কয়েক সহস্র মানুষের জীবনযাত্রায় ভালো-ভাবেই ব্যাঘাত ঘটবে।

বাঁধ ও ক্যানাল নির্মাণের ব্যাপারে ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে ধার ও ক্রেডিট (Loan & credit) চুক্তিতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রবেশ করে 1985 সালে। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যাঙ্ক শুধু তাদেরই প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ গণ্য করবে যাদের গ্রাম জলে নিমজ্জিত হবে এবং শুধুমাত্র তারাই পুনস্থাপিত ও পুনর্বাসিত হবার অধিকারী। এই সব মানুষের পুনস্থাপন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে বিবেচনা করা আমাদের প্রথম কাজ। কিন্তু আমাদের বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এমন সমস্ত মানুষই যাঁরা "উৎখাত / ক্ষতিগ্রস্থ হবেন জলাধার দ্বারা এবং আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো দ্বারা।" প্রেসিডেন্ট Conable-ও আমাদের বলেছিলেন যে ক্যানাল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পুনর্বাসন ও ক্ষতি পূরণের ব্যাপারটিও আমাদের বিবেচ্য বলে ধরতে হবে।

পরিবেশের প্রশ্নেও, "প্রকল্পের সকল দিক" বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছিল...

পুনস্থাপন ও পুনর্বাসন

মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যারা নিমজ্জনের জন্য বসতি হারাবে তাদের পুন:স্থাপন ও পুনর্বাস:নের সর্তাদি উল্লেখ করেছিলেন নর্মদা ওয়াটার ডিস্‌পিউটস্‌ ট্রাইবুলান। ভারত সরকার কিছু কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত সর্ত আরোপ করেছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ও দাদনের চুক্তিত এই দুটি ব্যাপারেই সর্তের উল্লেখ আছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলি এইসব সর্ত এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণে সত্যি কতখানি উদ্যোগী—ভারতে এবং ভারতের বাহিরে এখন তা নিয়েই বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

ব্যাঙ্কের কার্যনির্বাহী নির্দেশাবলী এবং নীতিসমূহকেও আমাদের খতিয়ে দেখতে হয়েছে। চুক্তি হয়েছিল 1945 সালে। ব্যাঙ্কের তখনকার নীতি অনুসারে প্রকল্প অনুমোদনের আগেই পুনর্বাসন ও পরিবেশ অভিঘাতের ব্যাপার খতিয়ে দেখা দরকার ছিল। কিন্তু সর্দার সরোবর প্রকল্পের ক্ষেত্রে তেমন কিছু করা হয়নি। ...**বস্তুত মানবিক ও পরিবেশগত অভিঘাত সম্পর্কে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রকল্পটি রচিত হয়েছিল; (পুনবাসন সংক্রান্ত) পরিকল্পনা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল, পরিবেশ-অভিঘাত নিরসনে ব্যবস্থাদির কথাও ছিল নিতান্তই দায়সারা।**

একথা উল্লেখনীয় যে ব্যাঙ্কই আমাদেয় এই পর্যালোচনা করতে বলেছে। ব্যাঙ্ক আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখতে দিয়েছে। খোলামেলা আলোচনায় অংশ নিয়েছে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকে ব্যাঙ্ক সহায়তা করেছে। আর কোন আন্তর্জাতিক সহায়তা-সংস্থা কখনও এমন ধরণের স্বাধীন পর্যালোচনা করতে চেয়েছে বলে মনে হয় না। প্রকল্পটিতে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু ঘটে থাকলে তা বুঝতে চাওয়ায় ব্যাঙ্কের এই ইচ্ছার দৃঢ়তা রীতিমত সম্ভ্রমযোগ্য।...

উঁচু বাঁধ নির্মাণের বেলায় অতীতে নির্মজ্জিত এলাকার মানুষ আকছারই উচ্ছেদ হয়েছেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। এমনকি কোন সুষ্ঠু পদ্ধতিও পালিত হয়নি। উন্নত এবং উন্নয়নশীল বহু দেশেই এমনটি ঘটেছে। এমন বহু ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ বলতে সাধারণত বোঝা হয়েছে কিছু নগদ অর্থ প্রদান, যা দিয়ে বড়জোর হয়ত নতুন একটু করে ভূখণ্ড পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে উন্নত এবং উন্নয়নশীল অনেক দেশই গ্রামীণ, অরণ্য ও সীমান্ত অঞ্চলে উঁচু বাঁধ নির্মাণ করেছে। প্রায়শই এর ফলে হাত পড়েছে স্থানীয় এবং উপজাতীয় মানুষদের জমিতে। এইসব মানুষদের বিশেষ অবস্থাই জন্ম দিল বিভিন্ন পন্থা ও ব্যবস্থাদির যাতে এঁদের বাধ্যতামূলক পুনর্বাসন কম কষ্টকর হয়।

1957 তে এল প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ঐ বছর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় (I L O) গৃহীত হল কনভেনশন 107; এতে বলা হ'ল যে উচ্ছেদ হওয়া স্থানীয় বা উপজাতিয় পরিবারগুলিকে "এমন জমি দিতে হবে যা অন্ততপক্ষে তাদের পূর্বে অধিকৃত জমির সমমানের হয়, যাতে তাঁরা তাঁদের বর্তমান প্রয়োজনই শুধু মেটাতে পারবেন তাই নয়, তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতিও হতে পারে।" 29 সেপ্টেম্বর, 1958 ভারত সরকার কনভেনশন 107 অনুমোদন করেন।

আর সেই ভারতেই 1979 সালে, নর্মদা ওয়াটার ডিসপিউটস্‌ ট্রাইবুনাল বললেন যে উচ্ছেদ হওয়া পরিবার যারা জমি হারাবে তারা জমির বদলে জমি পাবে, অন্ততপক্ষে দু হেক্টর (পাঁচ একর)। এছাড়াও ট্রাইবুনাল বললেন যে জমি ছিল এমন পরিবারের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (18 বছর ও তদুর্ধ্ব) পুরুষ পৃথক পরিবারভুক্ত বলে গণ্য হবে। উচ্ছেদ হওয়া ভূমিহীন পরিবারের জন্য ট্রাইবুনালের বরাদ্দ একটি পারিবারিক বাসস্থান।

"গৃহস্থালীর কাজে জলের ব্যাবহারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অথচ গ্রামের মানুষদের জল দেবার পরিকল্পনা বা খরাপ্রবণ এলাকায় জল পৌঁছানোর পরিকল্পনা এখনও প্রাথমিক স্তরই অতিক্রম করেনি।"

ভারত সরকার এবং তিনটি রাজ্য সরকার এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে, ট্রাইবুনালের নীতি অনুসারে, জমির বদলে জমি শুধু তারাই পাবার অধিকারী যাঁদের বিধিবদ্ধ জমির মালিকানা থাকবে। উপজাতীয় মানুষ যাঁরা জবরদখল করা জমিতে জঙ্গলে কাজ করতেন জমি কিংবা পুনর্বাসনের সুপারিশ তাদের জন্য ট্রাইবুনাল করেননি—এটাই সরকারী অভিমত।

1980 সালে বিশ্বব্যাঙ্ক সর্বপ্রথম একটি সাধারণ পুনর্বাসন নীতি গ্রহণ করে। এতে ব্যাঙ্ক স্পষ্টই বলে যে পুনস্থাপনই যথেষ্ট নয়,

পুনর্বাসনও জরুরী। এই নীতিতে বলা হল যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষরা পুনস্থাপনের ফলে "অন্ততপক্ষে তাঁদের আগের জীবনযাত্রার মান অর্জন করিবেন।" বাঁধ ও ক্যানাল দ্বারা উচ্ছেদ হওয়া মানুষও এর মধ্যে পড়বেন। এরপর 1982 সালে ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উপজাতীয় মানষদের জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয় যে প্রচলিত ভূমি ব্যবহার পদ্ধতিকে স্বীকার করতে হবে। এবং উপজাতীয় মানুষদের একতাবদ্ধ জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহীতাকে নিতে হবে এবং কেবলমাত্র তখনই তাদের উচ্ছেদ করা উচিত।

1979 র ট্রাইবুনাল নির্দিষ্ট ব্যবস্থাদির উপর নির্ভর করেই তিনটি রাজ্য সর্দার সরোবর প্রকল্প জনিত পুনর্বাসন নীতি ঠিক করে। কিন্তু সেই ট্রাইবুনাল একটি আন্ত রাজ্য বিতর্ক মীমাংসা করতে চেয়েছিল শুধু। গোটা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষজনের ক্ষতিপূরণের নীতি-নির্দেশ করতে ট্রাইবুনাল চায়ও নি, আশাও করা যায় না। ট্রাইবুনাল গুজরাতের উৎখাত মানুষদের কথা উল্লেখই করে নি; ক্যানাল ও সেচ ব্যবস্থার দ্বারা বহু মানুষের ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনাও ট্রাইবুনাল বিচার করেনি; উৎখাত হওয়া জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও ট্রাইবুনাল বিবেচনায় আনে নি। ট্রাইবুনালের রিপোর্টে উপজাতীয় মানুষদের নিয়ে না ছিল কোন আলোচনা, না ছিল জবরদখলকারীদের সমস্যার উল্লেখ অথবা 'ভূমিহীনতা'র ব্যাখ্যা।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময়, 1985 সালে, স্থানান্তরণ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও মূল্যায়নের কোন ভিত্তিই স্পষ্ট ছিল না। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা ছিল অজানা, সম্ভাব্য ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনায় আনা হয়নি, ক্যানালের কথা ভুলেই যাওয়া হয়েছিল। সম্ভাব্য ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন সেরকম মানুষজনের সঙ্গে কথাও বলা হয়নি। এমন স্পষ্ট তথ্যও জানা ছিল না যাতে সাফল্য বা ব্যর্থতা নিরূপণ করা যায়। ফলতঃ, সুষ্ঠু কোন পুনর্বাসন পরিকল্পনাই ছিল না এবং প্রকল্পের মানবিক মূল্যও সেজন্য ধর্তব্যে আনা হয়নি। মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে সে মূল্য-শোধের নীতি নিধারণও তাই করা যায় নি।

চুক্তি সই করার সময় ব্যাঙ্ক উৎখাত হিসেবে ধরেছিল শুধু জমির মালিকদেরই—ট্রাইবুনালের সংজ্ঞা মেনে। এর মধ্যে জবরদখলকারীরা ছিল না। তাছাড়া, সাবালক পুরুষদের প্রশ্নটাও ব্যাঙ্ক বিবেচনায় আনেনি। ফলে উৎখাত হওয়া উপজাতীয়দের বৃহদংশেরই ভূমিহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অপরদিকে, ক্যানাল সম্পর্কিত চুক্তির ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক নতুন করে উৎখাত বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখেনি। উৎখাতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শুধু তারাই যারা 'নিমজ্জনের' কবলে পড়বে বা প্রকল্পের পরিকাঠামোর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যদিও 1980 সালে ব্যাঙ্ক স্বীকার করে নিয়েছিল যে ক্যানাল ও সেচব্যবস্থা দ্বারা বাস্তুচ্যুতদেরও পুনর্বাসন দরকার।

1990 তে ব্যাঙ্ক উৎখাত হওয়া সমস্ত মানুষের জন্য একটি সাধারণ নীতি ঘোষণা করে এবং 1991-তে উপজাতীয়দের জন্য ঘোষণা করে একটি বিশেষ নীতি। এইসব নীতির বয়ানে একদশক আগের নীতি-সূত্রগুলিকেই বিবৃত ও বিস্তৃত করা হয়।

ব্যাঙ্কের গৃহীত নীতিতে মানবাধিকার বিষয়ে নতুন আন্তর্জাতিক উপলব্ধিসমূহের প্রতিফলন ঘটে। বৃহদাকার প্রকল্পসমূহ—গ্রামীন এলাকায়, অরণ্যে বা সীমান্ত এলাকায় যে বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে, যেমন করে যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়—এই বোধের স্বীকৃতি ছিল এসবের মধ্যে। উন্নয়নের পথে বাস্তুচ্যুত মানুষদের প্রশ্নটি এভাবে সামনে আসে এবং এ প্রয়োজন উপলব্ধ হয় যে প্রকল্প জনিত বাস্তুহারা-দের মানবধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হবে। ILO 107 অনুযায়ী এসব অধিকার জাতীয় স্বার্থ বা সার্বভৌমত্বের কথা বলে কোনমতেই খর্ব করা চলবে না। জাতীয় সার্বভৌমত্বের বা স্বার্থের প্রয়োজনে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু এতদ্বারা প্রকল্প রূপায়ণের সময়ে এসব অধিকার হরণ করার যৌক্তিকতা বর্তাবে না।

তিন রাজ্যের সরকারই দাবী করেন যে তাঁরা ট্রাইবুনালের নির্দেশ মানতে প্রস্তুত এবং ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পাদিত ঋণ চুক্তিও মেনে চলবেন। কিন্তু, ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক বা মতপার্থক্য তাতে দূর হয় না। 4700 উৎখাত হওয়া পরিবারের জন্য গুজরাত সরকার 1988 সালে যে নীতি গ্রহণ করেন, তাতে প্রতিটি জমি হারানো বাস্তুচ্যুত পরিবার দুই হেক্টর করে জমি পাবেন। এবং ভূমিহীন হিসেবে চিহ্নিতরাও দুই হেক্টর জমি পাবার অধিকারী হবেন। ফলে উপজাতীয় সহ অন্য সব মানুষ যারা জমি ভোগদখল করে চাষ করতেন তাঁরাও সকলেই দু হেক্টর করে জমি পাবেন। সাবালক পুত্ররাও দু হেক্টর করে জমি পাবেন।

"সরকার ইতিমধ্যেই প্রচুর অর্থ খরচ করেছেন। কেউই চাইবেন না যে এই অর্থের অপচয় হোক। কিন্তু আমরা সতর্ক হতে বলব যে আরও এগিয়ে গেলে অপচয় শুধু বেড়েই যেতে পারে।

গুজরাত সরকার (এবং মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের সরকারও) মনে করেন যে গুজরাতের নীতি ট্রাইবুনালের নির্দেশ এবং ব্যাঙ্কের সাথে চুক্তিকেও ছাপিয়ে গেছে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার যথাক্রমে 3000 এবং 2300 উৎখাত পরিবারের কেবলমাত্র তাদেরই দু হেক্টর জমি দিতে চায় যাদের আগে বৈধ জমি ছিল। কিন্তু পরিবারের সাবালক পুত্রদের তাঁরা দু-হেক্টর জমি দিতে চান না; এই দুটি রাজ্য সরকার জবরদখলকারীদেরও পর্যাপ্ত জমিতে পুনর্বাসনের অধিকার স্বীকার করেন না।

তিন রাজ্যের এই নীতিগত বৈষম্য—ট্রাইবুনালের রিপোর্ট তথা ব্যাঙ্কের সাথে চুক্তির বয়ানের নিহিতার্থ নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই বিতর্ককে টেকনিক্যাল মনে হতে পারে কিন্তু এর সমাধানের উপরই

নির্ভর করছে হাজার হাজার উৎখাত হওয়া পরিবারের সুষ্ঠু পুনর্বাসন।

বিতর্কের প্রথম বিষয় হ'ল সাবালক পুত্রের জমি পাওয়া। মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র সরকার মনে করেন বৈধ জমির মালিকদের সাবালক ছেলেদেরও দু হেক্টর করে জমি দিতে, অর্থাৎ এসব পরিবারের প্রত্যেক সাবালক ছেলেকে আলাদা পরিবার হিসেবে গণ্য করতে, তাঁরা বাধ্য নন। ট্রাইবুনালের নীতির এই ব্যাখ্যা তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন।...

অবশ্য, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার যদি এই নীতি মেনেও নিতেন, তবুও তাতে উপকৃত মতন শুধুমাত্র বৈধ জমির মালিকদের সাবালক ছেলেরাই কারণ ট্রাইবুনাল জবরদখলকারীদের জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। এবং এখানেই আসছে বিতর্কের দ্বিতীয় বিষয়—জবরদখলকারীদের অধিকারের বিষয়। আগেই বলা হয়েছে মধ্য-প্রদেশ বা মহারাষ্ট্র সরকার মনে করেন যে জবরদখলকারীদের ভূমিহীন হিসেবেই গণ্য করতে হবে, তাঁদের পর্যাপ্ত জমি বা চাষী হিসেবে পুনর্বাসনের দায় তাদের উপর বর্তায় না। এখানে বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন উপজাতীয় মানুষরা।...মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র বলছে—এঁরা অবৈধ দখলদার মাত্র।

ফলে এই দুই রাজ্যে হাজার হাজার উপজাতীয় পরিবার যাঁদেরকে ভূমিহীন হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু আসলে যারা দীর্ঘকাল ধরে জমিতে চাষবাস করে আসছেন—তাঁরা পুনর্বাসনের জন্য হয় কোন জমিই পাবেন না বা পাবেন প্রয়োজনের তুলনায় কম জমি। উভয় রাজ্য অবশ্য কিছু ব্যতিক্রমের সংস্থান রেখেছেন। যদি কোন জবর দখলকারী প্রমাণ করতে পারেন যে একটি নির্দিষ্ট বছরের আগেও (মহারাষ্ট্রে 1978 এবং মধ্যপ্রদেশে 1987) দখলীকৃত জমিতে চাষ করছিলেন তবে তিনি তা নথিভুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য চাই নথি, যা বহুক্ষেত্রেই নেই। আমাদের হিসেবে মহারাষ্ট্রে ও মধ্যপ্রদেশে উৎখাত হওয়া উপজাতীয়দের 60 শতাংশ পরিবারই পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত জমি পাবেন না।

ভারতে 6 কোটিরও বেশী উপজাতীয় রয়েছেন। তাঁদের অনেকেই জমির উপরই জীবিকা নির্বাহ করেন। যে জমি তাঁরা বংশপরম্পরায় চাষ করে আসছেন। 1987 সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব-কমিশন (ব্রান্ডট ল্যান্ড কমিশন) উপজাতীয় ও স্থানীয় মানুষের জমির ও সম্পদের অধিকারের স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলেন—এইসব জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায্য ও মানবিক যে কোন নীতির ভিত্তি হওয়া উচিত জমি ও অন্যান্য সম্পদের উপর এঁদের ট্রাডিশনাল অধিকারের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা। কেননা এঁদের জীবনচর্চা এই অধিকারের উপরই নির্ভরশীল যদিও তাঁরা নিজেরা হয়তো এই অধিকারকে এমন ভাষায় প্রকাশ করেন যা প্রচলিত আইনী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ভারত সরকার এবং তিনটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের চুক্তির মূলগত নীতি দাবী করে যে ভূমিহীন সহ উৎখাত হওয়া সমস্ত মানুষের পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসনের ফলে যেন "জীবনযাত্রার মান উন্নত না হোক অন্ততপক্ষে যেন আগের অবস্থায় আসে।" উৎখাত হওয়া যেসব মানুষের একমাত্র দক্ষতা কৃষিকর্মে, এবং কৃষিই যাদের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি তারা যদি যোগ্য জমিই না পায়, তবে জীবনযাত্রার মানের নিশ্চয়তা কি করে দেওয়া সম্ভব? 1984 সালে প্রকল্প তদারকি করার জন্য গঠিত নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটি ঘোষণা করে যে "উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে জমি ছাড়া অন্য কোন কার্যকরী পুনর্বাসন সম্ভব নয়।" আমরাও এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে, অন্ততপক্ষে বজায় রাখতে, এটিই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। জবরদখলকারীদের ভূমিহীন উৎখাতের দলে ফেলার অর্থ হ'ল তাঁদের ভূমিহীন কৃষিমজুর হবার দিকে ঠেলে দেওয়া। অথচ এঁরা চাষ করেন এমন জমি যা এঁরা নিজেদের বলে গণ্য করেন। এটা পুনর্বাসন নয়। এর ফলে এঁরা পূর্বতন অবস্থাটুকুও বজায় রাখতে পারবেন না।

মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের উপজাতীয়রা এ সম্পর্কে অবহিত। যখন আমরা মহারাষ্ট্রের একটি উপজাতি গ্রাম—বামনী পরিদর্শনে গিয়েছিলাম, গ্রামবাসীরা বললেন, "আমরা চাষী, ক্ষেতমজুর নই।" আমরা মনে করি মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার জবর দখলকারীদের পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ (চাষের) জমি দিতে অস্বীকার করে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অমান্য করছেন।

রাজ্যদ্বয়ের বক্তব্য : উৎখাত হওয়া সকলেরই অধিকার আছে গুজরাতে পুনর্বাসন পাবার যেখানে জমির মালিক হোক বা না হোক সকলকেই দু হেক্টর করে সেচ সেবিত জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র ধরেই নিয়েছে যে বিপুল সংখ্যক উৎখাত হওয়া মানুষ গুজরাতেই পুনর্বাসন গ্রহণ করবেন। বস্তুত, মধ্যপ্রদেশের পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ঐ রাজ্যের উৎখাত মানুষের জন্য যা প্রয়োজন, তার মাত্র দশ শতাংশ জমির সংস্থান রয়েছে।

কিন্তু নিজের এলাকার প্রতি নানাবিধ টানের কারণেই হোক আর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার জন্যই হোক বহুসংখ্যক উৎখাত হওয়া মানুষই গুজরাতে যেতে চান না (মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ থেকে)।

এঁদের অনেকের পক্ষেই সেটা হবে এক দীর্ঘ সংস্কৃতিক পথ পরিক্রমা। ট্রাইবুনালের নীতি বা ব্যাঙ্কের চুক্তি অনুসারেই উৎখাত হওয়া মানুষদের অধিকার আছে নিজ নিজ রাজ্যেই পুনর্বাসন পাবার। একথা ঠিক যে বিগত 18 মাসে পুনর্বাসন রূপায়নে গুজরাত কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু এযাবৎ গুজরাত প্রায় 3000 পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়ে উঠতে পেরেছে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের আরও প্রায় 15000 পরিবারকে স্থানান্তর করা ও পুনর্বাসন দেওয়া গুজরাতের পক্ষে এক বিরাট বোঝা, ঐ রাজ্যের সীমিত সামর্থ্যও ধরাবে রীতিমত টান। তাছাড়া, প্রশ্নটা শুধুমাত্র পুনঃস্থাপনের নয় পুনর্বাসনের। রাজ্যগুলি হয়তো হাজার হাজার পরিবারকে গুজরাতে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমরা মনে করি না গুজরাতের পক্ষে তাদের সকলকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে।

আমাদের মতে, ব্যাপারটা এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। বাস্তব সত্য হ'ল মধ্যপ্রদেশ এপর্যন্ত পুনস্থাপন ও পুনবাসনের কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করে নি। মধ্যপ্রদেশ যদি ট্রাইবুনাল এবং ব্যাঙ্কচুক্তিকে সম্মান দিয়ে তার নীতি পরিবর্তনও করে, তবু কি আশা করা সঙ্গত হবে (গ্রামগুলি) নিমজ্জনের আগে যে সময়টুকু আছে তার মধ্যে সে সেই নীতি রূপায়িত করতে পারবে? না চাইলেও সিদ্ধান্ত করতেই হচ্ছে —না, তা কখনই সম্ভব নয়।

মহারাষ্ট্রে নিমজ্জিত হবে এমন 33টি গ্রাম দুটি তালুক তথা জেলায় ছড়িয়ে আছে—অক্কালকুয়া এবং আক্রানি। আক্কালকুয়া গুজরাতের সীমান্তবর্তী এবং উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান থাকার জন্য অক্কালকুয়ার কিছু কিছু গ্রামের বেলায় মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাত চলে যাওয়া পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই ধরা হয়েছে। এপর্যন্ত প্রায় 400 অক্কালকুয়া পরিবার গুজরাতে চলেও গেছেন।

কিন্তু মহারাষ্ট্রের উৎখাত পরিবারদের মহারাষ্ট্রেই জায়গা পাবার অধিকার আছেই। 1990 তে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের সম্মতিক্রমে তালোদার নিকটবর্তী 2700 হেক্টর বনভূমি এই উদ্দেশ্য পাওয়া গেছে।

মহারাষ্ট্রে পুনস্থাপন ও পুনর্বাসনের সমস্যাটি গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহারাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী জবরদখলকারীদের (এবং সাবালক পুত্ররাও) কেউই যথেষ্ট পরিমাণ জমি পেতে পারে না। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে 24টি আকরানী গ্রামের অধীবাসীদের যাদের কারও বিধিসম্মত কোন জমি নেই, বড় জোর বেআইনি দখলদার হিসেবে গণ্য হতে পারেন এবং এক একর করে জমি পেতে পারেন।

প্রথমে যা ভাবা হয়েছিল, মহারাষ্ট্রে উৎখাত হওয়া পরিবারের সংখ্যাও তার চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াবে। ট্রাইবুনালের হিসাবে 450টি পরিবার ধরা হয়েছিল,। 1983তে তা বেড়ে দাঁড়ায় 2000-এ। আর এখন এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় 3000-এ। তালোদা-অরণ্যের জমি এদের সকলের জন্য একেবারেই অপর্যাপ্ত। এমনকি যদি 24টি আক্রানী গ্রামের সকলকে ভূমিহীন হিসেবেও গণ্য করা হয়। বাড়তি অরণ্যভূমি পাবার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।...

নিমজ্জিত এলকার উৎখাতদের জমি দেবার ক্ষেত্রে গুজরাতের সাফল্য সত্ত্বেও, 1960-61 তে উৎখাত হওয়া পরিবারগুলিও এখনও কোন জমি পায় নি। কেভাদিয়ার ছটি গ্রামের জমি সে সময়ে অধিগৃহীত হয়েছিল, বাঁধ নির্মাণের জন্য। এঁদের কেউ কেউ অবশ্য কিছু নগদ টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। কিন্তু 1985 থেকে এঁরাও ব্যাঙ্ক চুক্তির আওতায় এসেছেন। জমি পাবার অধিকারের স্বীকৃতি এঁদের সাত বছর আগেই পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ব্যাঙ্ক গুজরাতের কাছ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে, উপযুক্ত জমির প্রকৃত হস্তান্তর দূরের কথা।

বস্তুত অতি সম্প্রতি ভারত সরকার ও রাজ্যগুলির কাছে ব্যাঙ্ক দাবী নয়, অনুরোধ জানিয়েছে যে তাঁরা যেন সাবালক পুত্রসন্তানদের জন্য ট্রাইবুনালের 1979 তে ঘোষিত নীতি মেনে নেন এবং ব্যাঙ্কের চুক্তি অনুযায়ী জবরদখলকারীদের জমি দেবার ব্যাপারেও পরিকল্পনা রচনা করেন।

ট্রাইবুনালের ঘোষণা বা চুক্তি মানা নিশ্চিত করতেই ব্যাঙ্ক যে শুধু ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, ক্যানাল নিয়ে গুজরাতের সঙ্গে চুক্তিতে ব্যাঙ্ক তার নিজের নীতির প্রতি সমর্থনটুকুও আদায় করতে পারে নি। ক্যানাল ও সেচ ব্যবস্থা রূপায়ণে 140,000 পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবেন, যাঁদের মধ্যে অন্তত 13000 পরিবার তাঁদের সা বা প্রায় সব ভূমিই খোয়াবেন। ক্যানাল ও সেচব্যবস্থার জন্য যাঁরা জমি হারাবেন তাঁরা 1894 সালের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। কতজন সেটা পাবেন সেটা এখন হিসেব পাল্টা হিসেবের ব্যাপার হয়েই আছে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে এই আইনে অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ যা প্রাপ্য, তা ক্ষতি বাড়িয়েই তুলবে এবং বর্তমানে জমি কেনার দামের তুলনায় তা নিতান্তই কম।

আমরা মনে করি বর্তমান প্রকল্পটি ত্রুটিপূর্ণ। এখন যা পরিস্থিতি তাতে প্রকল্পের দ্বারা উৎখাত মানুষদের পুনস্থাপন ও পুনর্বাসন অসম্ভব। এবং এ দায়িত্ব ব্যাঙ্কেরও। 1985'র ঋণ চুক্তিতে ক্যানালের জন্য উৎখাত হওয়াদের পুনর্বসন সহায়তার কথা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যদিও তা পাঁচ বছর আগে থেকেই ব্যাঙ্কের নীতির অঙ্গ ছিল।

মানবাধিকারের মর্যাদা অনুধাবনের প্রয়াস থেকে পুনস্থাপন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত নতুন নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্যাঙ্কের নীতি-সমূহ এইসব রীতি প্রবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে; ভারতও তার অনেকগুলি গ্রহণ করেছ! 1958'র ILO 107 কে ভারত সমর্থন জানিয়েছে। 1985 তে ভারত ও তার তিন রাজ্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঋণ ও ক্রেডিট চুক্তিতে সই করেছে। তবুও যদি শেষে দেখা যায় ভারত ও তার রাজ্যগুলি ট্রাইবুনাল ও ব্যাঙ্কচুক্তির নীতিগুলি পালনে ব্যর্থ হচ্ছে বা ব্যাঙ্ক ব্যর্থ হচ্ছে তার নীতিগুলিকে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে তাহলে বলতেই হয় যে সর্দার সরোবর প্রকল্পের পুনর্বসন ব্যবস্থা মানবাধিকারের স্বীকৃত রীতিনীতির মূলেই আঘাত করছে। অথচ ভারত ও বিশ্বব্যাঙ্ক উভয়েই মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে সদাই অগ্রণী।

এই রিপোর্টের অনুবাদ করেছেন **রবীন মজুমদার**। এর দ্বিতীয় পর্ব "পরিবেশ অভিঘাত ও তার প্রতিকার" স্থানাভাবে এই সংখ্যায় দেওয়া গেল না।... পরের সংখ্যা বি ও বি তে থাকবে।

ছড়ায় বসুন্ধরা বৈঠক

—নিশীথ চৌধুরী

এক

বিশ্ব নাচে তোমায় নিয়ে
বসুন্ধরা মাগো,
পরিবেশের ছেলের ডাকে
এবার তুমি জাগো।
এমন ছেলে কোথায় পাবে
গুণের ছেলে তারা,
তোমায় মেরে তোমার শোকে
পাগল হল যারা।

দুই

রিও ডি জে নিরো
সকলেই যে হীরো-বাহারে!
বৈঠকে ঠক ঠক
শুধু বুলি টল টক—আহারে!

তিন

দূষণের কারবার
চলছে ও চলবে,
নিন্দুকে কত কথ
বলছে ও বলবে।
মিছিমিছি চেঁচামেচি
করে যত ভালচার
দিনরাত করি ভাই
শরিবেশ কালচার।

চার

সম্মেলনে নরম গরম
আলোচনার পর,
খানা পিনা স্ফূর্তি আমোদ
যেমন খুশি কর।
আলোচনার ফলটা নিয়ে
ভাবছে বসে যারা,
গলফ করে বলতে পারি—
বেআক্কেলে তারা।

R. N. 34929/79
YEAR 15, NUMBER 5-6
March-June 1992

A bi-monthly magazin
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C/o Dr. A. Lahiri
P 252 Lake Town, Block A, Calcutta
PIN 700089

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী প্রকাশিত

- বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক হালচাল
- বিজ্ঞান শিক্ষা মাধ্যমিক হালচাল
- না হিরোসিমা নাগাসাকি চাইনা
- এবং নতুন-পুরনো পত্রিকা

নাগরিক মঞ্চ প্রকাশিত

- পাবলিক সেক্টর
- আক্রান্ত জলাভূমি
- আক্রান্ত শ্রমিক
- AGAINST THE WALL

॥ ব ই মে লা য় আ সু ন ॥

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15C পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9 থেকে মুদ্রিত।